ইষ্টলাইট
বুক-হাউস

॥ প্রকাশিত ॥

●

পরিমল গোস্বামী

॥ সম্পাদিত ॥

●

ব্যঙ্গ জীবনেরই একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গী, সমাজে এর বিশেষ মূল্য স্বীকৃত। তাই ব্যঙ্গ সাহিত্য সব দেশেই বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশেও ব্যঙ্গ সাহিত্যের জন্মকাল থেকেই রচিত হয়ে আসছে, কোন যুগেই ব্যঙ্গ-কৌতুক সাহিত্য থেকে বাদ পড়ে নি। সব মিলিয়ে তার কি রূপ তা এইরকম একখানি সংকলন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে জানবার উপায় ছিল না। সেই উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম যুগ আজ পর্যন্ত বিখ্যাত ৪৩ জন সাহিত্যিকের লেখার এই সংকলন

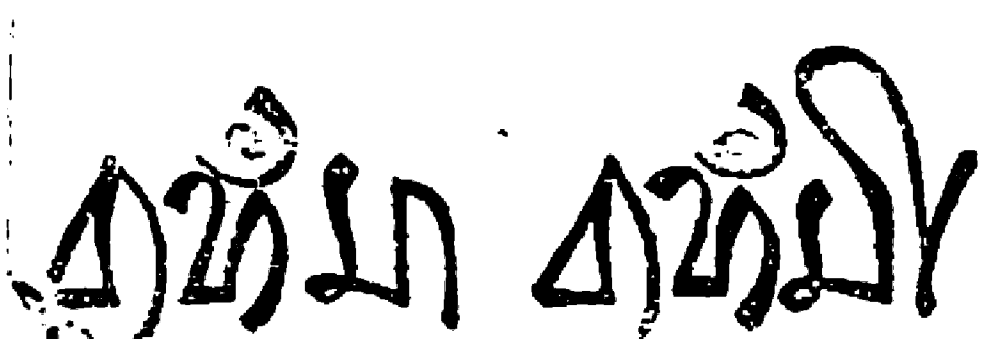

॥ দাম সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

সুন্দর ৫-রঙা প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ॥

প্রকাশিত হলো ॥ ৪২৫ পৃষ্ঠা ॥

॥ ইষ্টলাইট বুক হাউস ॥

॥ ২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা ১ ॥

॥ সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায় ॥

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

॥ ভবঘুরের চিঠি ॥

২।০

॥ প্রবোধকুমার সান্যালের ॥

॥ জুয়া ॥

৩৸০

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের ॥

নিশিবিহঙ্গ ৪৲ ॥ নূপূর ২॥০ ॥ ছায়াসঙ্গিনী ৩৸০ ॥ উল্কা ৪॥০ ॥

॥ আশাপূর্ণা দেবীর আংশিক ৩॥০ ॥

সরোজ রায়চৌধুরীর

॥ সোমলতা ॥

৩।০

অচিন্ত্যকুমারের

॥ দিগন্ত ॥

২॥০

শশাঙ্কমোহন চৌধুরীর

॥ কাল পরিক্রমা ॥

৪৲

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্যের

॥ পদ্মরাগ ॥

রহস্যোপন্যাস

২॥৹

॥ সদ্যপ্রকাশিত ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

দুই রাত্রি

৩॥০

॥ শীঘ্রই বেরুচ্ছে ॥

নীলকণ্ঠের

জীবনরঙ্গ

কলকাতায় কেরাণীজীবনের অসামান্য কাহিনী। সুবৃহৎ উপন্যাস ॥

শক্তিপদ রাজগুরুর

স্বপ্নময়ী

স্বার্থ আর প্রেমের সংঘাতে অপূর্ব কাহিনী। মনোরম প্রচ্ছদ।

২॥০

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

॥ পুথিঘর ॥ ২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ॥

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

সুনীল ঘোষের

ব্যাকুল বসন্ত ৪।০ নায়ক-নায়িকা ৩।০

॥ অর্ণ্যমৃগয়া ৬৲ ॥

॥ নীলকণ্ঠ বিরচিত ॥

॥ ননীগোপালের বিয়ে ॥

ননীগোপাল দে ডবল বি. এ. অবিবাহিত প্রতিভাবান যুবক। স্কুলে মাষ্টার-মশায়ের সর্বকর্মে দক্ষ যে—এক কথায় তাকে কি বলে,—এই প্রশ্নের উত্তরে যেদিন সে বলল : দক্ষযজ্ঞ,—সেইদিনই বোঝা গিয়েছিল সে প্রতিভা। ননীগোপালের বিয়ে সেই দক্ষযজ্ঞের ইতিহাস নয় শুধু ভূগোলও বটে। বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন বাদে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ এই হাসির উপন্যাস ব্যঙ্গ নয়, শ্লেষ নয়, কষাঘাত নয়, নির্মল রঙ্গের নিঝর। অফুরন্ত হাসির রঙীন উৎসব।

সাহিত্য ভবন

॥ দুটাকা বারো আনা ॥

॥ রামপদ মুখোপাধ্যায়ের ॥

॥ আলপনার রঙ ॥

শ্রদ্ধাস্পদ মনীষী চিন্তাশিল্পী শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় বলেছেন : কলকাতার মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের যে চিত্র এঁকেছেন তা যেমন সত্য, তেমনই উদ্বেগজনক। .....'আলপনার রঙ' পড়লে অনেকে উপকৃত হবে।

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তর ॥ **ময়ূর মহল** ॥

নীহাররঞ্জন বললেই যে দুর্নিবার রহস্য, ঘটনাস্রোত, কৌতূহল, অভাবিত পরিণতি, অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ পাঠক-পাঠিকার মনে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে 'ময়ূর মহলে' তারই সার্থকতম স্বাক্ষর।

॥ তিন টাকা ॥

॥ নূতন ঠিকানা ও নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র ॥

॥ বাক্-সাহিত্য ॥

॥ ৩৩. কলেজ রো, কলি-৯ ॥

CENTRAL LIBRARY

লিলি

ভালোবাসার
সবার উপরে

ক মা রি তা র
বা সে ও গ ন্ধে
অ তু ল নী য়

লিলি বিস্কুট কোং (প্রাইভেট) লিঃ কলিঃ-৪

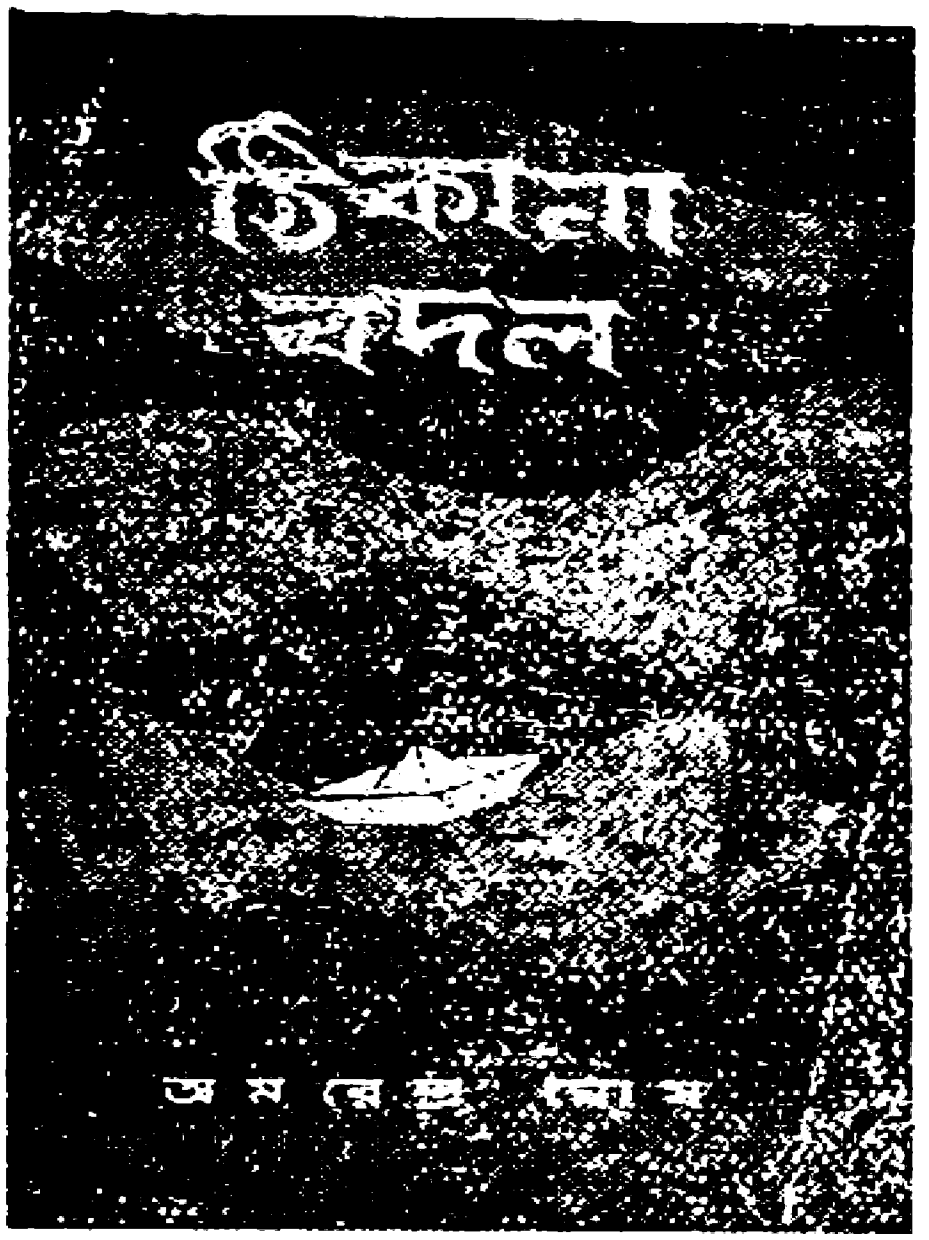

ভাগ্যের অনির্দিষ্ট ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত এক যুবতী এই শহরে নিজের জীবনকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিল। বিভিন্ন পারবেশে এবং বিচিত্র মানুষের মনের দর্পণে সেই ক্লান্ত মেয়েটির ছবি অমরেন্দ্র ঘোষের নিপুন লেখনীতে চিত্রিত হয়েছে। দাম পাঁচ টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স

॥ কলিকাতা ১২ ॥

সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে একটি মেয়ের জীবনের আবর্তময় কাহিনী। শারদ-সাহিত্যে প্রকাশিত হবার পরেই আলোড়ন এনেছে। প্রভূত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে

॥ নারায়ণ গঙ্গোর ॥

এসিধারা

॥ প্রকাশিত হয়েছে। ৩·৫০ টাকা ॥

আরেকখানি উল্লেখযোগ্য

॥ বাংলা বই ॥

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর **জলে ডাঙায়** ৩·৫০ টাকা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **কন্যাকুমারী** ৩·০০ টাকা ॥ চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর **গল্প লেখা হল না** ১·৫০ টাকা ॥

॥ সতীনাথ ভাদুড়ীর ॥ **সংকট** ॥ ৩·৫০ টাকা ॥

॥ **জাগরী** ॥ **ঢোঁড়াই মানস চরিত** ॥ **সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী** ॥

॥ **চকাচকী** ॥ **চিত্রগুপ্তের ফাইল** ॥

॥ বিচিত্র রূপিনীর লেখকের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ ॥

CENTRAL LIBRARY

বিনয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

'পুথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোন ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।'

—রবীন্দ্রনাথ

॥ মূল্য ॥ আঠারো টাকা ॥

পুস্তক প্রকাশক

॥ ৮।১-বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২ ॥

CENTRAL LIBRARY

অচলপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

॥ পান্নালাল ॥
॥ তিনটে-ছটা-নটায় ॥
॥ এডালটারেটেড ॥
ফ্র্যানচাইস
॥ রবিবারেও রেহাই নেই ॥
॥ বিলম্বিত ॥
॥ চিঠিপত্তরের জঞ্জাল ॥
॥ পুস্তক সমালোচনা ॥
॥ সাহিত্য দুঃসম্বাদ ॥
॥ বাংলায় খবর বলছি ॥

প্রকাশক
॥ মুদ্রক ও ॥
সম্পাদক
দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল
৩২ই, ল্যান্সডাউন রোড
পি. বি. প্রেস থেকে
ছেপে ২৭-সি চক্রবেড়ে
রোড নর্থ : কলি ২০
থেকে প্রকাশ করেছেন।
: দাম :
সাধারণ সংখ্যা ৫০ ন. প.
বার্ষিক ছ'টাকা মাত্র

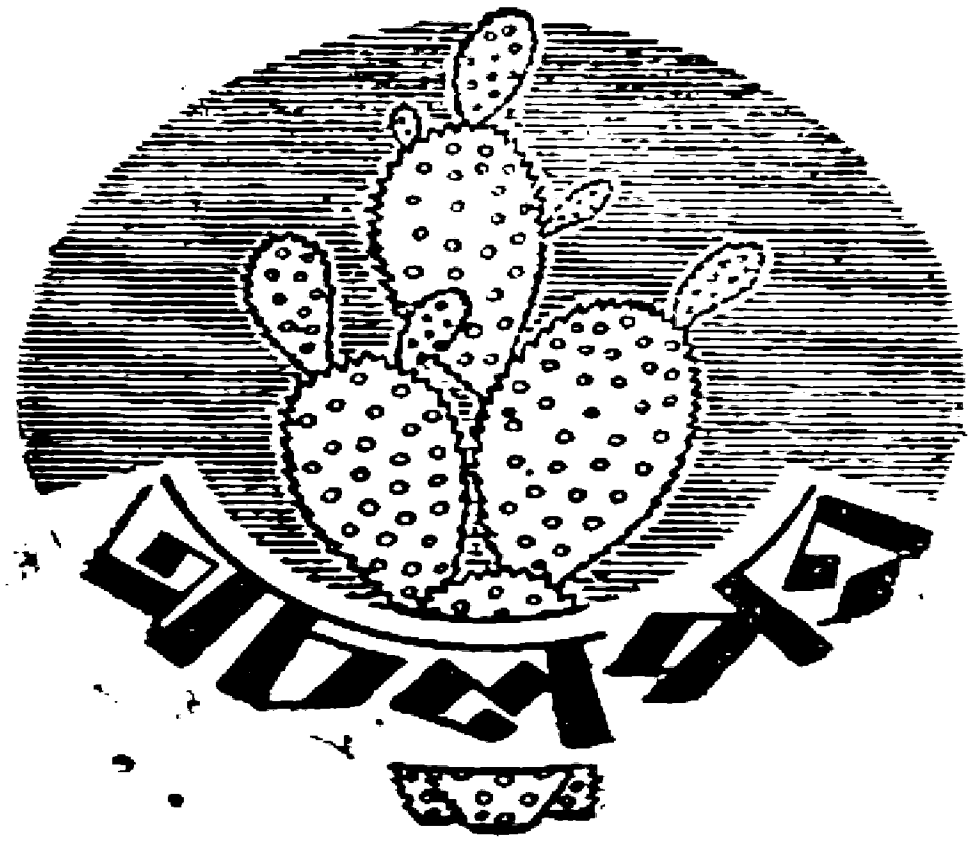

॥ জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৪ : নবপর্যায় ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা ॥

॥ পা ন্না লা ল ॥

॥ নীলকণ্ঠ ॥

এক যে আছে পান্নালাল !
এমনি বটে ঠাণ্ডা মানুষ,
রঙীন যত কথার ফানুস,
রাগলে কিন্তু নেইক হুঁশ !
এমন কে আছেন যে
তখন তার খান্না গাল ?
রাগলে মোদের পান্নালাল !
'ঘরের লোকে পায়না খেতে',
শুনলে ওঠে ভীষণ তেতে,
তক্ষুণি চায় বাইরে যেতে—
কোঁথায় কে আছিস যে
'আন্না ঘোড়া আন্না ঢাল'
চেঁচিয়ে বলে পান্নালাল !
বিশ্ব প্রেমে ভীষণ মুগ্ধ ;
তুললে কথা : "জীবন যুদ্ধ",—

পান্না ক্ষুব্ধ ; বিশ্ব স্তব্ধ
এমন কে আছেন যে
দেখেননি চোখ কান্নালাল ?
ক্ষুব্ধ হলে পান্নালাল !
মানুষ ত নয়, সতেজ টাট্টু ;
ঘুরছে যেন ঘুরণ লাট্টু—
পেরিকাম টু সিকিম-বাট্টু ;
এমন কে আছেন যে
সেই তালেতে দেননা তাল ?
ঘুরছে যখন পান্নালাল !
এমনি বটে নিরাসক্ত,
শক্ত-লোকের ভীষণ ভক্ত,
ভাণ্ডা দেখে ঠাণ্ডা রক্ত !
এমন কে আছেন যে
দেখেন নি রে পান্না হাল ?
মাঝ দরিয়ায় পান্নালাল !
নিজের ঘরে নিজের ছবি—
বাঁধিয়ে রাখার ভীষণ হবি ;
হাসছে যেন ফুলের টব-ই !
এমন কে আছেন যে
সেই 'হাসি'তে কাণ না লাল ?
পোজ দিলে এ পান্নালাল !
বকতে পারে এক নাগাড়ে,
বন্‌বাদাড়ে হোই পাগাড়ে,
ময়না যেন সোনার দাঁড়ে
এমন কে আছেন যে

॥ অচলপত্র পরিকল্পিত এই ব্যঙ্গচিত্রটি এঁকেছেন ওমিও ॥

CENTRAL LIBRARY

॥ ১৪ ॥

বলবে ঃ "বাবা আর না,—
কাল্ !"
বক্‌ছে যখন পান্নালাল !
পরতে খেতে চাইলে কিছু—
বিশ্ব-সভায় মাথা নীচু,
সেপাই আসে পিছু পিছু ;
এমন কে আছেন যে
দাঁড়িয়ে খাড়া, খান্‌না টাল?
ডাক্‌লে পুলিশ পান্নালাল।
আজকে পান্না বলবে যাহা,
শোনাও যদি কাল্‌কে তাহা,
বল্‌বে ঃ না, না, মিথ্যে ডাহা ;
এমন কে আছেন যে
মুখেতে যাঁর খান্‌না কাল ?
মোদের প্রভু পান্নালাল !
অঙ্গ, বঙ্গ, নয় কলিঙ্গ
রঙ্গমঞ্চে মঞ্চরঙ্গ,
করতে পারে শান্তিভঙ্গ
এমন কে আছেন যে
কুমীর ডাকা চান্‌না খাল ?
কাট্‌ছে যখন পান্নালাল !
কাজ নেই যে তাইতে ব্যস্ত,
প্লান রয়েছে মস্ত মস্ত,
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে শত হস্ত,
এমন কে আছেন যে
পাঁচ কিম্বা পঁচনি শাল
জান্‌তে চাইবে, পান্নালাল ?

॥ দৈনিক স্বাধীনতা (রবিবার ৩।২।৫৭) থেকে পুনর্মুদ্রিত ॥

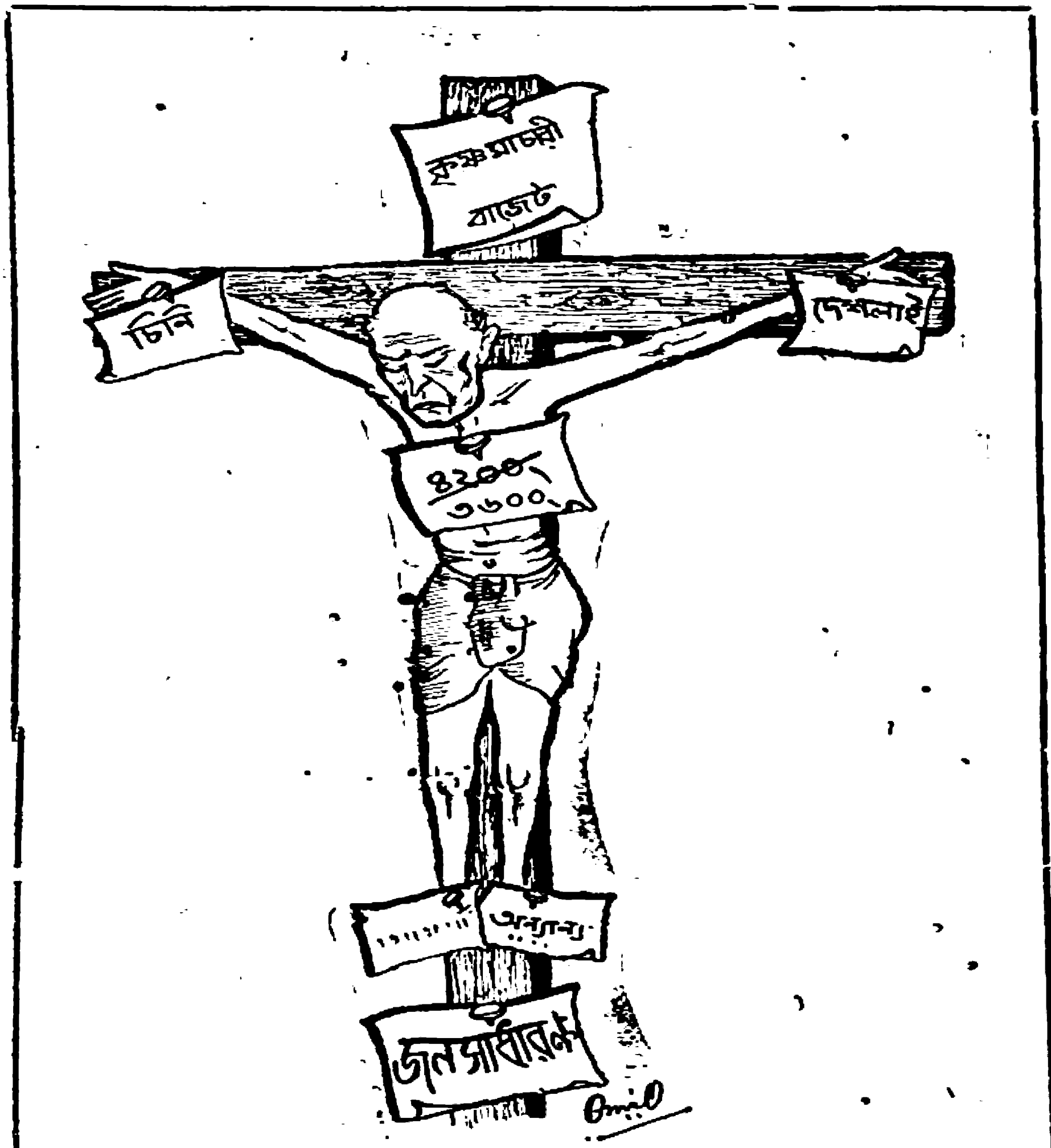

॥ অচলপত্র পরিকল্পিত এই ব্যঙ্গচিত্রটি এঁকেছেন ওমিও ॥

॥ সবিনয় নিবেদন ॥

রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মোহিতলাল' শীর্ষক প্রতিশ্রুত রচনাটি এ সংখ্যায় সময় মত হাতে না আসায় আগামী সংখ্যায় যাবে। তাঁর অন্য একটি রচনা এ সংখ্যায় গেছে। সোমেন্দ্রনাথ রায়ের গল্পের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল যা বলে লেখকই সে নামের রূপান্তর সাধন করে নব নামকরণ করেছেন। প্রণয় গোস্বামীর একটি গল্প এবং পরিভাষা সম্পর্কে সুধাংশু বন্দ্যোঃর একটি অল্পমধুর আলোচনা আগামী সংখ্যায় যাবে॥

নারায়ণদাশ শর্মা বর্তমানে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার বঙ্গানুবাদে ব্যস্ত। দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল রম্যরচনায়। সৈয়দ মুজতবা আলি ও অবধূত আগামী দু'এক সংখ্যার মধ্যেই আমাদের টার্গেট হবেন। দুটি বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করব বলে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। একটি স্বর্গত অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাস একটি নদীর নাম। অপরটি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর একটি উঠোন। দুটিই বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় সংযোজন।

—নটবর, ও-ঠাকুর চলবে না! একটা কমজোরী ঠাকুর চাই, বুঝেচ?

॥ রবীন ॥ ॥ অচলপত্র ॥

তি ন টে-ছ টা-ন টা য়

॥ INSANE গল্প, SANE পরিচালনা ॥

'সত্তার তিন অবস্থা',—এই অতি পুরাতন পরীক্ষিত প্রবাদও যে অর্ধসত্য মাত্র, পুরো সত্য নয়,—এভারেস্ট সিনে কর্পোরেশনের তথা শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তথা শ্রীঅসিত সেনের দ্বিতীয় কিন্তু অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে প্রায় অদ্বিতীয় 'পঞ্চতপা' ছবিটি দেখে প্রথমেই এই উপলব্ধি পীড়াদায়ক। শুধু সত্তার নয়, দামী বস্তুরও তিন অবস্থা হওয়া যে বিচিত্র নয়, বাংলা ছায়াচিত্রেতিবৃত্তে প্রায় দুর্মূল্য, দুর্লভ পঞ্চতপা তারই প্রমাণ। দক্ষিণ কলকাতায় দস্তুরমতো গৃহীত ও মফঃস্বলে উপেক্ষিত, উত্তর কলকাতায় না গৃহীত না উপেক্ষিত, পঞ্চতপা এক অভূতপূর্ব বস্ত্র অফিস অভিজ্ঞতা। এই বস্ত্র অফিস অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে যে মোটা গল্পের অভাবে মফঃস্বল তার মুখ ফিরিয়েছে ও উত্তর কলকাতা যেখানেই হক; উত্তর কলকাতার অধিবাসীবৃন্দ এখনও থিয়েটার-সিনেমার ব্যাপারে প্রায় মফঃস্বলী। আর দক্ষিণ কলকাতা? মফঃস্বলে যা চলবে না, উত্তর কলকাতা যার সম্বন্ধে দ্বিধা করবে, দক্ষিণ কলকাতা রুদ্ধশ্বাস উৎসাহে তাকে অভিবাদন জানাবে, এই ত চিরন্তন রীতি। তাই ড্রামার অভাবে যত dull আর drab হক, ফিচার ফিল্‌ম্ হক যত ডকুমেণ্টারী, নতুন কিছু হলেই হল। দক্ষিণ কলকাতা দুবাহু তুলে তক্ষণি স্বাগত জানাবে। এর সঙ্গে চিত্রালোচনায় যদি কোনও দৈনিক পত্রিকার সিনেমা সম্পাদক মন্তব্য করেন যে অমুক ছবি ছবির জগতে নূতন যুগ এনেছে তাহলে ত আর কথাই নেই। সেই যুগের বন্যায় ভেসে যাবে না এমন কেউ যদি কোথাও থাকে ত থাক; বালীগঞ্জে, সাদার্ণ এভেন্যুতে, মাণ্ডেভিলা গার্ডেন্‌সে, নিউ আলিপুরে তেমন একজনও নেই!

পথের পাঁচালীর ইতিহাসও তাই। বরং পথের পাঁচালীতেই প্রথম, পঞ্চতপায় তার পুনরাবৃত্তি। যদিচ পথের পাঁচালীর সঙ্গে পঞ্চতপার পার্থক্য স্টেইসম্যানের সঙ্গে আমাদের জাতীয়তাবাদী সম্বাদপত্রের ব্যবধানের চেয়েও অনেক সুদূর। পথের পাঁচালী এবং তার পরিচালকের জাত আলাদা, স্বাদ ভিন্ন, সাফল্যও অন্যস্তরের। কিন্তু সেকথা নয়, পথের পাঁচালী দক্ষিণ কলকাতাতেই প্রথমে প্রত্যাখ্যাত। পরে অনুগৃহীত এবং তারপরে জয় ধ্বনিত। এবং দক্ষিণ কলকাতার চাপে পড়েই একরকম উত্তর কলকাতায় চালু। এবং তারও পরে মফঃস্বলে অগত্যা প্রদর্শিত। দক্ষিণ কলকাতায় প্রথমে প্রত্যাখ্যাত এবং পরে পূজিত হবার মূলে খবর কাগজে এই চিত্রের গলায় সমালোচকদের মাল্যদানই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ কার্যকরী হয়েছে। তারপর মুঠি খুলেছে দক্ষিণ কলকাতা আস্তে আস্তে। মুঠো

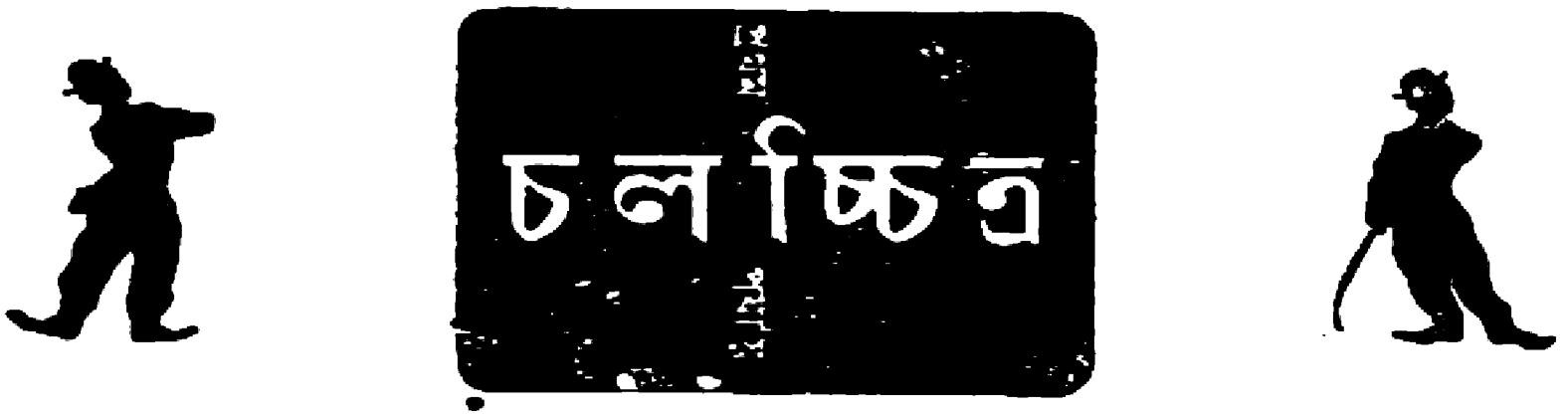

মুঠো অযাচিত দক্ষিণায় পথের পাঁচালী দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহর মহিমায়। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় তবে কেন পথের পাঁচালী প্রথম দিন থেকেই পায় নি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সোচ্চার অভিনন্দন? এবং অপরাজিত যা পথের পাঁচালীর চেয়ে অনেক, অনেক বেশী পরিণত পরিচালনার স্বাক্ষর বহন করেছে, তার বেলায় কেন বক্স অফিস পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হল দক্ষিণ কলকাতাতেও?

এর উত্তর হচ্ছে, উপরোধে লোকে চ্যারিটির টিকিট কেনে একবার। আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ লটারীর টিকিট কেনে জীবনভোর। কেনে, তার কারণ লটারীর টিকিটের সঙ্গে লটকানো থাকে আশা; আশা পূর্ণ না হলেও থাকে তামাশা। চ্যারিটির টিকিটে এ দুবস্তুই অনুপস্থিত। তাই পথের পাঁচালী তেমন ভালো লাগে নি বলেই তেমন ভালোর চেয়েও বেশী এমন ভালো বলতে হয়েছে যেমন ভালো সত্যই পথের পাঁচালী হয় নি।

যেমন ভালো হওয়া কোনও ছবির পক্ষেই প্রায় অসম্ভব, সোনার পাথর বাটির মত সম্পূর্ণ না হলেও আরোব্যপন্যাসের মত প্রায় অলীক। ক্লাসিক গানের কঅক্কর গোমাংস শ্রোতারও যেমন সমঝদার সাজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সাজা পাওয়াই সার হয়; দাঁড়কাকের ময়ুর হয়ে গিয়ে কথামালার ইলাষ্ট্রেশনে হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তেমনি ক্লাসিক ছবিরও দর্শক সংখ্যা এখনও ময়ূরের মতই বিরল। মোটা গল্পের মাসিক পাঠক-পাঠিকাই নয় শুধু, সাপ্তাহিক সিনেমা দর্শক এখনও দাঁড়কাকের মত অগণ্য;—একথা বিস্মৃত হলে বাংলা দেশে ছবি তৈরী করার বিপদ এখনও বহুদিন অব্যাহত। দুধের বদলে পিটুলিগোলা খেয়ে যাদের অভ্যাস ডালভাতের বদলে হঠাৎ পোলাও-কালিয়াতে তাদের পেট ছেড়ে দেবার ভয়টা সম্পূর্ণ অমূলক নয়।

অমূলক নয় যে,—তার প্রমাণ পথের পাঁচালীর পর অপরাজিত। তাই বা কেন? পথের পাঁচালীতেও তার প্রমাণ অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল। পথের পাঁচালীর ক্ষেত্রে সমালোচকদের উপরোধে দর্শকদের ঢেঁকি গেলা কিন্তু কেবলমাত্র উপরোধে পড়ে নয়। পথের পাঁচালীর শেষ পর্যায়ে মেলোড্রামার পিটুলি গোলা দিয়ে নাট্যরস পানের পরিতৃপ্তিই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্স অফিস মুখ রক্ষা করেছে? শুধু রক্ষা করে নি,—ভালো ছবি চলার বক্স অফিস রেকর্ডও করেছে। কিন্তু পথের পাঁচালীর বক্স অফিস আসো সে আসলে আলেয়া তা বুঝতে না পেরেই সত্যজিত রায় অপরাজিতকে আরোও drab, আরোও dull, আরও ডকুমেন্টারীস্টিক করতে গিয়ে মরুদ্যানের বদলে মরীচিকায় পৌছে বিচলিত হয়ে তারাশঙ্করের জলসাঘরে প্রবেশ করেছেন অতঃপর। এবং এই প্রসঙ্গেই পুনরুক্তি অপরিহার্য যে পথের পাঁচালীর বেলায় যাদের ময়ূরপেখম মেলতে দেখা গিয়েছিল, অপরাজিত-র মুক্তি মাত্র তাদের দাঁড়কাক সদৃশ চীৎকার বিসদৃশতার অভিজ্ঞতায় তুলনাবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

কিন্তু শুধু মাত্র দর্শক নিন্দাই এর একমাত্র উত্তর নয়। সত্যজিত রায় নিজেও এর অদ্বিতীয় আরেক কারণ। কথা-সাহিত্যের পরিবর্তে শ্লোগান-সাহিত্যের প্রতি সত্যকারের সাহিত্যরসিক বিমুখ হতে বাধ্য, নিছক প্রোপাগাণ্ডার আওয়ায় সাহিত্যের গণ্ডা দেওয়া যেমন সাহিত্যসেবকের পক্ষে

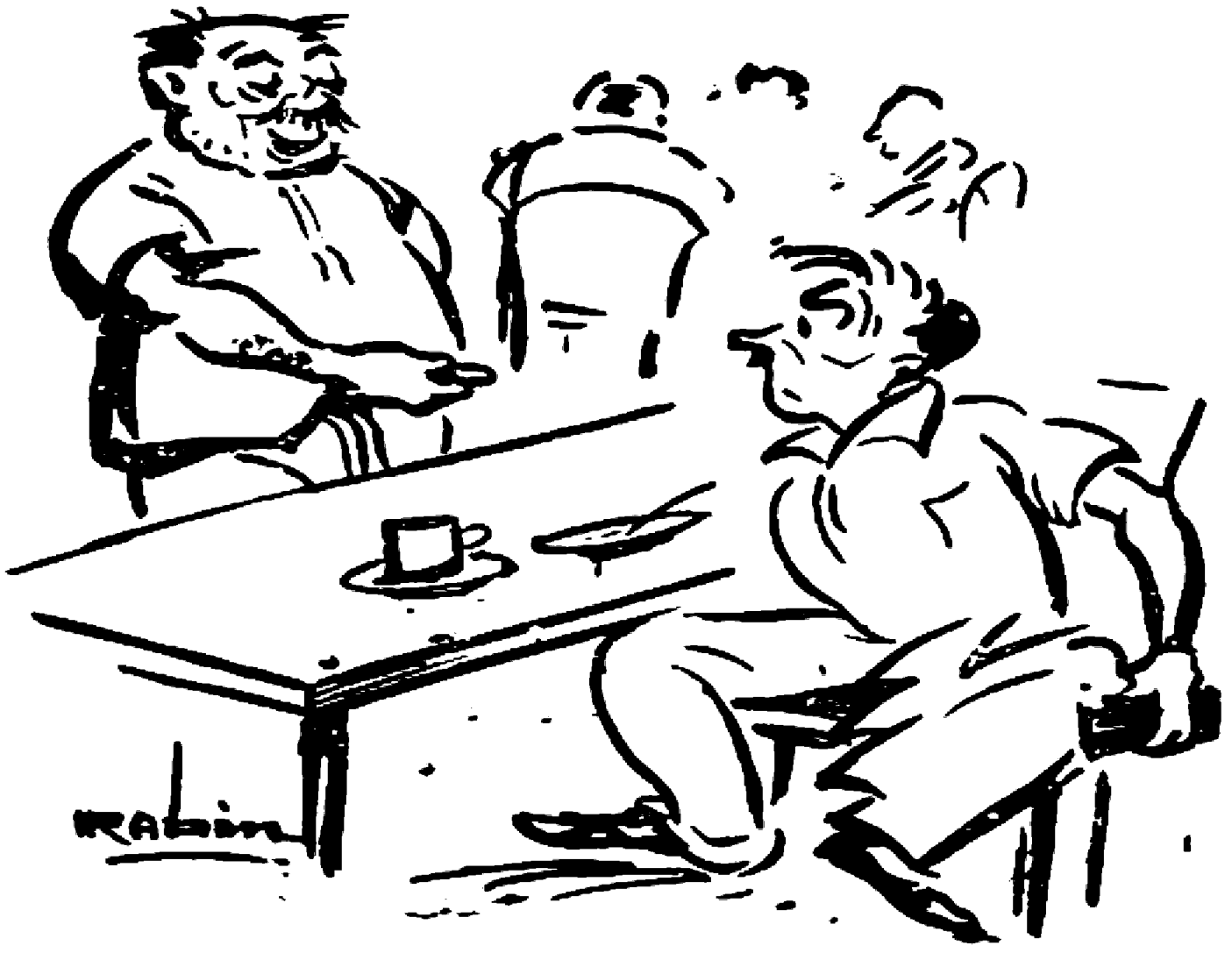

—আটানা বিল হয়েছে ? নাও, আটানাই নাও.—
যেমন তোমার খাবারের ; তেমনি তোমার চেহারা !
তেমনি আপনার আধুলির ! —পালটে দিন !

॥ অচলপত্র ॥ ॥ রবীন ॥

ধর্মচ্যুতি। ইলিয়া এরেনবুর্গ যেমন 'ঝড়' এর পরেও রাশিয়াবাসী এই কারণেই কেবলমাত্র রাশিয়ান লেখক কিন্তু কোনও ক্রমেই তলস্তয়, ডষ্টয়-ভস্কি, তুর্গেনিভ, গর্কীর স্বগোত্র নয়। নয় তাঁদের মহৎ উত্তরাধিকারী। হাওয়ার্ড ফাষ্ট সর্বোত্তম রচনাতেও বৃহৎ জার্নালিস্ট মাত্র। মহৎ সাহিত্যস্রষ্টা নন কিছুতেই। নন, কারণ,—এঁরা কথা সাহিত্যের বদলে কথামালা রচনা করেছেন, মর‍্যাল আছে, মুন্সীয়ানা আছে, তথ্য আছে, তত্ত্বও। নেই শুধু প্রাণ। এঁদের বই স্ট্যারেটিভ, গল্পও নয়। তাতে অনুতাপ আছে, উত্তাপ নেই। ফিজিক্যাল বর্ণনা আছে, ইমোশান থেকে রসে উজ্জীবন নেই। ছক আছে. তাই নিছক প্রপাগাণ্ডায় পর্যবসিত আজকের হাঘরেদের জন্য নির্মিত সাহিত্য মেড টু অর্ডার। মেড টু অর্ডার বলেই আগামীকালে তা বাসি হতে বাধ্য।

সাহিত্যে যা সিনেমাতেও তাই। সিনেমাও সাহিত্যের মত বাহন মাত্র। এক-টাতে কলমের মুখে জীবন উচ্চারিত, আরেকটায় ক্যামেরার চোখে 'জীবন' দর্শন। সে-ই জীবনের গল্প উপস্থিত না হলে কলমেরও দাম নেই, ক্যামেরারও না। দর্জির ডামির মত তা যতই প্রচ্ছদ প্রসাধিত হক, প্রাণহীন বলেই তা অর্থহীন। পৃথিবীজুড়ে আজ শুধু প্রাণরক্ষার জন্য খাদ্যেরই অভাব নয়, মৌলিক চিন্তারও অভাব প্রকট মনীষারক্ষার ক্ষেত্রে। খাদ্য যেমন দেহের জন্য প্রয়োজন, মণীষার জন্য তেমনি চিন্তা। চিন্তাই হচ্ছে মানুষের আত্মা। সেই আত্মা রক্ষা না করলে মানুষের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্যে এবং সিনেমায় আজ ব্যক্তির অভাব নেই। অভাব ব্যক্তিত্বের। গড্ডলিকাস্রোতের বিরুদ্ধে গা ভাসাতে পারে এমন ব্যক্তিত্ব বিরল হয়ে আসছে বিশ্বজুড়ে। যে ব্যক্তি, যে ব্যক্তিত্ব, নূতন মূল্যবোধ, চিরপুরাতন জীবনের নূতন কাহিনী শোনাবার স্পর্ধা রাখে। তাই সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস-কবিতার পরিবর্তে রম্য রচনা, সত্য মিথ্যায় মিশান জীবন চরিতের গোঁজামিল, উকীল ডাক্তার অভিনেতার দিন লিপি। ছন্দ ছাড়া, ছন্নছাড়া না গদ্য না কাব্য গদ্যকবিতার আগাছা আবির্ভাব। সিনেমাতেও তাই গল্পের বদলে টেকনিক, ক্যামেরা, থ্রিডাইমেনশনের হুযুগ। সাহিত্যের সিংহাসনে তাই আজ সম্বাদপত্রের অনধিকার আসীন, সিনেমার বিশ্বে তাই টেলিভিসনের অনধিকার প্রবেশ।

—ক্ষুধার্তর জন্য ভাত রাঁধেন নি ?

—রেঁধেছি ! বারোটার সময় এসে খাবে—

॥ রবীন ॥ ॥ অচলপত্র ॥

সত্যজিত রায়ের পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত দুটি অদ্বিতীয় চিত্রনাট্যেই চিত্র উপস্থিত, নাটক অনুপস্থিত। বাংলা চিত্রশিল্পের হাতেখড়ি হল এতদিনে তাঁর হাতে। যে বাংলা ছবি রুচিশীল চিন্তাশীল চক্ষুষ্মান বাঙালী কাছে জন্মমুহূর্ত থেকে এতকাল অশ্রাব্য দর্শনঅযোগ্য ছিল, সেই বাংলা ছবিকে তিনি জাতে তুলেছেন। যে বাঙালী প্রতিভা অথবা ট্যালেন্ট স্পর্শ করেছে জীবনের সর্বক্ষেত্র, সেই বাঙালী ট্যালেন্ট কোন অজ্ঞাত কারণে কে জানে ছায়াচিত্রের মত এত বড় মিডিয়াম থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। সত্যজিত রায় সেই অভিশপ্ত পাষাণে রচনা করলেন অনবদ্য অহল্যা। সব ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গেই যেকথাও বেঠিক নয় তাহল সত্যজিত রায়ের ক্ষমতা ওই হাতেখড়ি দেওয়া পর্যন্ত। তার বেশি নয়। এটা বোঝা গেছে বেশ যে তিনি শিল্পী, জীবনবিমুখ শিল্পী। জীবনবিমুখ বলেই তাঁর ছবি ডকুমেন্টারী। হিউম্যান ডকুমেন্টারী বলে তাকে মর্যাদা দিতে চাইলেও ভোলা অসম্ভব যে পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত দুইই নির্মমভাবে প্রাণের সৌরভশূন্য বর্ণাঢ্য কাগজের ফুল। তা বিউটিফুল হতে পারে, কিন্তু full of LIEF নয় কিছুতেই।

মানুষের জীবন সম্বন্ধেই নয় শুধু, কাহিনীর প্রাণ সম্পর্কেও তিনি নির্মম উদাসীন। তাই পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত দুই-ই শিল্পসুষমাবিমণ্ডিত হয়েও নিষ্প্রাণ। ও-ই দুটি গল্পের কাহিনীকার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এতে সত্যজিত রায়ের কিছু যায় আসে না, এমন একটা উগ্র পীড়াদায়ক মর্মান্তিক অনুভাব - দুটি ছবির পশ্চাতেই খাঁড়ার মত সদা উদ্যত। বিভূতিভূষণের লেখার চেয়ে সত্যজিত রায়ের ছবি এইটে বলতে পারার আনন্দেই পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত দুই-ই দিক-ভ্রান্ত। চিত্র তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এই কারণেই তাঁর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে কাহিনীর মূল আবেদন লক্ষ্যভ্রষ্ট। অপরাজিত কাহিনীর চিত্রনাট্যে লীলার চরিত্রটি ছিলো; জানি, ব্যক্তিগত অপ্রীতিকর কারণে লীলার চরিত্রটি চিত্রে অনুপস্থিত। ব্যক্তিগত বলেই সে আলোচনার স্থান অচলপত্রে নেই। কিন্তু এ-ও জানি যে সত্যজিত রায় তা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তিনি যে কাশীকে ছায়াচিত্রে আঁকতে পেরেছেন তাঁর ধারণা এতেই অপরাজিত সার্থক। কিন্তু কাশীর জন্য কাশীখণ্ড আছে, তার জন্য অপরাজিত নয়।

পথের পাঁচালী এবং অপরাজিতয় প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলা মানুষের প্রয়োজনেই। মানুষের প্রয়োজনেই প্রকৃতি, প্রকৃতির প্রয়োজনে মানুষ নয়। লীলা-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অপরাজিতর চিত্ররূপ দিলে তা বিচিত্র এবং অপরূপ এক বস্তু হয় বটে কিন্তু সঠিক চিত্ররূপ হয় কি? যেমন হয় না শ্রীকান্তর তৃতীয়-চতুর্থ খণ্ডকে বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের নাট্যরূপ। কিছুতেই হয় না, পাঁচশো রাত্রি যদি একাদিক্রমে চলে,—তবুও না। এবং লক্ষ্য করলে দৃষ্টিভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয় যে সত্যজিত রায় ছায়াছবিতেও 'Take' করার বদলে ধরে ধরে 'Paint' করতে পছন্দ করেন বেশী। তিনি নাটকে প্রবেশ করতেই ভয় পান। তাই Out door-এ দৌড়তে হয় তাঁকে অনবরত। গল্পের অভাব ঢাকবার চেষ্টা করেন দৃশ্যরচনার ডিটেলসের প্রভাবে। এবং জীবন বিমুখ শিল্পী বলেই তিনি 'জলসাঘরে' যেতে চলেছেন। জলসাঘর নির্বাচন তাঁর শক্তির অপব্যয় সূচিত করে মাত্র। জলসাঘরেও সবাই থাকবে, থাকবে না শুধু জলসাঘরের চরিত্ররা; থাকবেন না তারাশঙ্কর। দশবছর অন্তর একটি ছবি করলে তাঁকে মানাত, ছবির পর ছবিতে ক্রমশই তাঁর ব্যাহত অগ্রগতির চেহারাটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে,—বাংলা চিত্রজগতের প্রথম সত্যকারের চলচ্চিত্র করে সত্যজিত রায় সম্পর্কে এই আশঙ্কা আশার কথা না হলেও একেবারেই অমূলক কি?

সত্যজিত রায় সম্পর্কে আমার যে আপত্তি, ঠিক তার উল্টো আপত্তি করি বাংলা ছায়াচিত্রজগতের একমাত্র ব্যক্তিত্ব জ্যোতির্ময় রায় সম্পর্কে। তিনি নাট্যকার, কিন্তু চিত্রনাট্যকার নন। সত্যজিত যেমন নাট্যউদাসীন, জ্যোতির্ময়বাবু তেমনি চিত্রউদাসীন। জ্যোতির্ময় রায়ের চিত্রকাহিনীও রীতিমত ভাবায়, ভাসায় না কেবলমাত্র। একটা গোটা প্রবন্ধ পুস্তকে যা বলে শেষ করা যায় না; একেকটি সংলাপে তা অনায়াসে উপস্থিত করতে পারেন তিনি। শাণিত ক্ষুরধার, অর্থপূর্ণ, দ্যুতিময়; দুর্লভ সংলাপ সম্পদে অনবদ্য কথাচিত্রকার টাকা-আনী-পাই-এর স্রষ্টা। তাঁর প্রত্যেকটি ছবির থিম্ মৌলিক চিন্তায় চিত্তাকর্ষক, বাস্তব সচেনতায় সজীব, তির্যক দৃষ্টিকোণের কল্যাণে তীক্ষ্ণ। চিত্রশিল্পকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন যেমন প্রথম সত্যজিত রায়; সিনেমাকে সাহিত্যের শীলমোহর দিয়েছেন তেমনি জ্যোতির্ময়

রায়। সিনেমার জন্য লেখা হয়েও তাঁর গল্প নিঃসংশয়ে সাহিত্যোত্তীর্ণ হয়েছে। এসবই ঠিক, কিন্তু তার সঙ্গে একথাও ঠিক যে জ্যোতির্ময় রায়ের আয়ত্বে কলম যেমন দাসখৎ লিখে দিয়ে দায়মুক্ত, ক্যামেরা কিন্তু তেমন তাঁর অনিবার্য আজ্ঞাবাহী হয়নি একবারও। তাঁর ছবি যদি ছবি না হয়ে থিয়েটারের নাটক হত তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হত না কিছুই। সিনেমা যে একটা বিশেষ মিডিয়াম, কলম চালাতে যেমন ক্ষমতার প্রয়োজন হয় ক্যামেরা চালাতে যে তার চেয়ে কম হলে চলে না,—তাঁর ছবিতে এমন প্রতীতি কোথায়? লেখনী চালনায় তিনি সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু পরিচালনায় তিনি পারদর্শী কোথায়? তিনি বলতে পারেন যে যাঁরা ছবির পরিচালনা সাধারণতঃ করে থাকেন তিনি তাদের চেয়ে খারাপ করেছেন কোথায়? করেন নি মানলাম, কিন্তু রাম-শ্যাম-যদু-মধুর চেয়ে খারাপ না করার দাবী কি বলবার মত! বাংলা দেশের অসংখ্য, অজস্র রাম-শ্যাম-যদু-মধু লেখকের চেয়ে খারাপ লিখবে না এমন দাবী যদি কোনও বাংলা ছবির পরিচালক করে বসে এবং সেই দাবীতে ছবির গল্প লেখে, সে দাবীকে গ্রাহ্য করবেন জ্যোতির্ময় বাবু?

মনে আছে উদয়ের পথের আকাশস্পর্শী সাফল্যের পর, জ্যোতির্ময় রায়ের কাছে আসেন ছবির কাহিনীর জন্য প্রমথেশচন্দ্র। গল্প দেবার প্রধান সর্ত দাবী করেন লেখক টাকার পরিমাণে নয়, স্বাধীনতার পরিমাপে। একটি অক্ষরও অদলবদল করা চলবে না বলে জ্যোতির্ময় রায় জানান। বড়ুয়া সাহেব আপত্তি করেন, স্বয়ং শরৎচন্দ্রের গল্পে তিনি অনেক পরিবর্তন প্রবর্তন করেছেন চিত্ররূপান্তরে একথা জানান। জ্যোতির্ময় সে আপত্তি নাকচ করেন। শরৎ-চন্দ্রের গল্প পরিবর্তন করবার যোগ্যতা যদি চিত্র পরিচালকের থাকত তাহলে শরৎচন্দ্রের মত গল্পও তাঁরা লিখতে পারতেন:—এই হয় জ্যোতির্ময় রায়ের বড়ুয়াকে জবাব। নিরুপায় বড়ুয়া সাহেব জিজ্ঞেস করেন: সামান্য সাধারণ সংলাপেরও কি একটু এদিকে ওদিক করবার ভার পরিচালকের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না শ্রীযুক্ত রায়? জ্যোতির্ময় বাবু তাতেও বলেন, না! যে সংলাপ বড়ুয়া সাহেবের কাছে সামান্য, লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যেমন, দৃষ্টান্ত সহযোগে বিচিত্রিত

[ডেন্টিস্টের মেয়েকে] : না ! আর তোমার বাবার কাছে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব কিছুতেই নয় ; যতবার প্রস্তাব করি ; ততবার একটা করে দাঁত তুলে নেন !

॥ অচলপত্র ॥ ॥ রবীন ॥

করেন নিজের বক্তব্য জ্যোতির্ময় রায়, ধরুন, তিনি বলেন বড়ুয়াকে; ধরুন, ঘরে বসে আছেন, এমন সময় খুব অন্তরঙ্গ কেউ এল; তাকে যে সংলাপে আপ্যায়ন করবেন আপনি, অচেনা কেউ এলে সংলাপের চরিত্রই কিন্তু বদলে যাবে। আবার বরণীয় কোন ব্যক্তি অভাবিত কেউ আবির্ভূত হলে সেই আপনার মুখ দিয়ে হয়ত কথাই বেরুবে না অনেকক্ষণ! —সেক্ষেত্রে সংলাপ রচনার ব্যাপারকে আপনি সামান্য বলবেন না অসামান্য বলবেন?

নিজের ক্ষেত্রে যাঁর এত চুলচেরা বিচার, নিজের বিশেষ গণ্ডীতে যাঁর কোনও গণ্ডী না মানা স্বাধীনতার দাবী, নিজের ক্ষমতার বাইরে পরিচালনার গণ্ডীতে তাঁর প্রবেশ কি তাঁর অনধিকার প্রবেশ নয়? পরিচালনা করে কিছু অর্থপ্রাপ্তি এছাড়া পরিচালনা করার আর কোনও অর্থ পাই না আমি খুঁজে। তাঁর প্রতিভা আছে, কিন্তু পরিশ্রম নেই। সেই প্রতিভা কাহিনী রচনায় নিয়োজিত করলে তিনি যত কাজ করবেন অপটু পরিচালনার বোঝা বয়ে ক্লান্ত হবেন তার চেয়ে অনেক বেশী। আর শাস্ত্র তাই বলেছে: স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।

পঞ্চতপার সমালোচনা করতে বসে অসিত সেনের কথা না বলে সত্যজিত এবং জ্যোতির্ময় রায়ের কথাই এতকরে এতক্ষণ কেন বললাম, তার কারণ আছে। ধান ভানতে শিবের গীত নয়, অসিত সেন এবং পঞ্চতপার জন্য অচলপত্র এখনও এতগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করবার মত পঞ্জিকা নয়। না অসিত সেন, না পঞ্চতপা,—দু'য়ের কেউই এখনও এতখানি দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। বাহ্যিক মিল দুজনের মধ্যে চেষ্টা করে যতখানি আনা যায় এতখানিই এনেও ভেতরের অমিল দুজনের মধ্যে এভারেস্ট সদৃশ উচু। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর যত দূরত্ব তার চেয়ে বেশী ফারাক সত্যজিতের সঙ্গে অসিতের। দুজনের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণে গুরুচণ্ডাল দোষ অমার্জনীয়। যদিচ অসিত সেন এবং সত্যজিত দুজনেরই ডাক নাম মানিক। যদিচ দুজনেই দুখানা মাত্র ছবি এ-যাবৎ করেছেন, এবং সত্যজিতের দুখানা ছবিরই কাহিনীকার এক এবং দুজনেরই দুটি ছবিরই প্রথম মুক্তি এক প্রেক্ষাগৃহে; দুজনেই দ্বিতীয় ছবিখানা দেখাবার আগে প্রথম ছবিখানা আবার দেখিয়ে নেন উপযুক্ত ব্যাতাবরণ সৃষ্টির কারণে। তবে সত্যজিত অরিজিনল, বাহ্যিক ক্ষেত্রেও অসিত সেন পরবর্তী পরিচ্ছেদ!

॥ দুই ॥

॥ আলোর বদলে চোনা ॥

আলোর বদলে যাতে চোনার ভাগ বেশী শিবরাম চক্রবর্তী তাকেই বলেছেন বাংলা সমালোচনা, বাংলা ছবির চেয়েও এককাঠি সরেশ হলো বাংলা ছায়াচিত্র সমালোচনা; আসলে আলোচনার অযোগ্য। এদেশে একজন চিত্র সমালোচকের কথা অন্তত জানি যিনি আকাশের নীচে উন্মুক্ত বাতায়নে বসে জলযোগ করতে করতে আমি বানান্ লিখতেন আমী বলে। বাংলা ছায়াছবি যদি এখনও Kindergarten স্টেজে থাকে; বাংলা ছায়াছবির সমালোচনা তাহলে কিণ্ডারগার্টেন অবস্থাও প্রাপ্ত হয় নি। Not Kindergarten. সংক্ষেপে N. K. G. স্তরেই রয়ে গেছে এখনও। নাহলে পথের পাঁচালীর সঙ্গে চলাচল ছবির তুলনা সম্ভব? এবং যখন তা সম্ভব হয় তখন আর একথা মনে করা অসম্ভব হয় না যে পথের পাঁচালীর যে স্তুতি দৈনিকপত্রের সিনেমা-সম্পাদকরা করেছিলেন তা-ও না বুঝেই করেছিলেন, ক্লাসিক গানে মাথা নেড়ে সমঝদার সাজার মত। তখন পরিস্কার হয় যে এ-প্রশংসা রিক্সাওয়ালার, রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, বলার মতই রিডিকুলাস।

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা যা ম্যাসে নেয় না তাই class! এবং বিক্রী হওয়া বুঝি বইয়ের বা ছবির অপরাধ। তাই বিপুল বিক্রীর প্রসঙ্গ উঠলেই বাঁধা যে উপমাটি সকলের মুখেই শুনি: বিক্রী হলেই যদি বই হয়, তাহলে ত শশধর দত্তর বই-ও বই! তার উত্তরে যদি কেউ বলে যে কেন বিক্রী হওয়াটাই যদি সত্যকারের বই হওয়ায় বাধা হয় তাহলে ত শরৎচন্দ্রের জাত যায়, কারণ এখনও পর্যন্ত বিক্রয় সংখ্যায় তাঁর বইকে ত কেউ ছাড়াতে পারে নি;—তাহলে এর উত্তরে এই সব নিরক্ষর পণ্ডিতজনদের নিরুত্তর হয়ে মাথা চুলকানো ছাড়া আর কি করনীয় থাকে? আসল কথা, বই-এর বিক্রয়ের ওপর বইয়ের ভালোমন্দ বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না। বিক্রীত হলেও বই ভালো হতে পারে, অবিক্রীত হলেও বাধা নেই ভালো হতে। বিক্রীত হওয়ার চেয়ে সাহিত্য হিসাবে অবিক্রীত হলেই তার চরম সার্থকতা। সাহিত্যের বেলায় যা, সব শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই তাই। ছবি ছবি হয়েছে কি না সেই বিচারই তার চরম বিচার। এবং সে বিচারে নির্বিচারে মুড়ি-মিছরির

একদর হয় না। আমাদের দেশের সমালোচকদের কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত ধ্যান-ধারণায় সব শঙ্করই এক। অন্নদাশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, তারাশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর, কবিশঙ্কর, এবং শুধুশঙ্কর,—এঁরা সবাই শঙ্কর সেই কারণে এরা এক, এর চেয়ে বর্ণসঙ্কর সমালোচনা আর কোন্ দেশে সম্ভব।

তাই চলাচল হাজার হপ্তা চললেও পথের পাঁচালী নয়, অপরাজিত ত নয়ই। অসিত সেন নন সত্যজিত রায়। তার জন্য অসিত সেনের কপাল চাপড়ানোর প্রয়োজন নেই, কেউই সত্যজিতের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য নন। সত্যজিত নিজের শ্রেণীতে একা নিঃসঙ্গ এবং নিজেই একটা শ্রেণী। রবীন্দ্রনাথ যে মানদণ্ডে লেখক শরৎচন্দ্র যেমন সে মানদণ্ডে লেখকই নন,—তেমনি সত্যজিত রায় যে মানদণ্ডে চিত্রপরিচালক সে মানদণ্ডে বাংলা দেশের আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত কেউ অশ্বচালক, অশ্বতরচালক,—কিন্তু চিত্রপরিচালক নয় একজনও। অসিত সেনরা হচ্ছেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি! উদ্ধত, নতুন কিছু করতে উদ্যতও বটে! কিন্তু দেবার মত উদ্বৃত্ত তাঁদের বড় অল্প।

॥ তিন ॥

॥ ফ্ল্যাস ব্যাক্ ॥

চাঞ্চল্যকারী চিত্রনির্মাতা এই অসিত সেনের অতীত চিত্রাভিজ্ঞতা কি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা জানতে পারছি তা হল,—তিনি আসামী একটি ছবি এর আগে পরিচালনা করেন।—অসমাপ্ত সেই আসামী ছবিটি যার নাম বিপ্লবী সেটি সম্ভবত শেষ করেন বিনু বর্দ্ধন। তারপর সুধীর মুখার্জির পাশের বাড়ীর বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণকালীন তিনি এভারেষ্ট ফটো স্টুডিওর Wall Cameraতে সাউণ্ড রেকর্ড করেন। একটা জিনিষ এ থেকে জানা যায় তিনি ভুইফোঁড় পরিচালক নন, এ-লাইনের অভিজ্ঞ লোক, এবং উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করেছিলেন মাত্র। চলাচলে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং পঞ্চতপা-য় জয়যাত্রা অব্যাহত। তিনি শুধু অভিজ্ঞ নন, কুশলীও বটে। দুটি চিত্রতেই তার স্বাক্ষর উজ্জ্বল। বাংলা ছায়াছবির আগের যুগের পরিচালকদের মত ঘুলছবি করেন নি! ছবিই করেছেন তিনি এবং ভালো ছবিই করেছেন।

॥ অচলপত্র ॥

ছবির মিডিয়াম তাঁর আয়ত্বে, সংক্ষেপে বলবার পটুতা অনস্বীকার্য, ডিটেল্‌সের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ! ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখাই যে চিত্রকার্যের প্রাণধর্ম এ-ধারণা আছে তাঁর। Visual medium যে সিনেমা মূলতঃ একাওজ্ঞান বিবর্জিত নন, শক্তির সঙ্গে পরিশ্রমের প্রয়াস পর্যাপ্ত পরিমানে উপস্থিত দুটি ছবিতেই। এছাড়া অচল পাত্রপাত্রীদের দিয়ে সচল অভিনয় আদায় করে নিতে সর্বক্ষেত্রে না হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য রকমে সার্থক। এর আগে বলেছি যে তিনি sane-পরিচালক, কিন্তু সর্বত্র তাঁর শ্যেনদৃষ্টির পরিচয় পাই নি। যেমন,—D. V. C.-র ডিটেলস্ যেভাবে ধরেছেন তা প্রশংসযোগ্য, কিন্তু এনকোয়ারীর কমিটির মেম্বার বলে যাদের দেখিয়েছেন (এক—কমল মিত্র বাদে) তারা যে কোনও পাড়ার রকে বসে নরকগুলজার করতে পারার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু কোন দায়িত্বপূর্ণ কমিটির মেম্বার হিসাবে হাস্যকর রকমের অবিশ্বাস্য। অথচ কন্ট্রাক্টর চরিত্রে যে অভিনেতা অবতীর্ণ তাঁর আকৃতিগত টাইপটি চমৎকার। অরুন্ধতি যে পাহাড়ী সান্যালকে বলল সে ইঞ্জিনীয়রকে ঘোল খাইয়েছে,—মাত্র এইটুকু বলে আর না বলার লোভ যে সম্বরণ করতে পেরেছেন পরিচালক সেন,—এর জন্য ধন্যবাদ। ঠিক অনুরূপ,—অরুন্ধতিই যে তার খাবার পাঠিয়েছিলো সেদিন ইঙ্গিতে মাত্র তা কেবল অরুন্ধতিকেই ইঞ্জিনীয়রের বুঝিয়ে দেবার কায়দা উপভোগ্য। পাহাড়ী সান্যালের মুখ দিয়ে চীৎকার করিয়ে. কাটলেট? কি-কি-কেন-কবে-কখন-কোথায় ইত্যাদির বুক অফ নলেজ খুলে বসেন নি; দর্শক সাধারণের প্রতি আস্থা স্থাপনের এই প্রয়াস অনুকরণযোগ্য।

কিন্তু টাকা ফিরিয়ে নেবার দৃশ্যে মেলোড্রামার প্রয়োজন কি ছিল? অথচ ওই দৃশ্যেই হাওয়ায় উড়ে আসা নোটটা খপ করে পকেটস্থ করার টাচ্‌টি ভোলবার নয়।

॥ চার ॥

॥ গল্প লেখক নয়. অঙ্ক লেখক ॥

পঞ্চতপা দামোদর ভ্যালীর পটভূমিকায় সেই মামুলী গল্পই। সংলাপের স্থ এক টুকরো উজ্জ্বল। আরম্ভেই সুন্দরী বলে একটি গরুর কথা জিজ্ঞেস করার

॥ ভিনটে-ছটা-নটায় ॥

প্রত্যুত্তরে ইঞ্জিনীয়রকে অরুন্ধতির জবাব; আপনার খোঁজ করছিল—বাহবাযোগ্য। (অসিতবরণ অবশ্য গরুর পেছনে না গিয়ে অরুন্ধতির কাছেই রয়ে গেল—অরুন্ধতিই বা কম সুন্দরী কিসে?) আরোও দুটি একটি সংলাপ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গল্পে কোনও বৈচিত্র্য নেই. গতি নেই, নাটকীয় বক্তব্য নেই. জাদু নেই, ক্ল্যাস নেই। ক্লাইম্যাক্সও নেই। এক দামোদর ভ্যালিকে সরিয়ে নিলেই এমন গল্প সাঙ্গুভেলীতে বসেও লেখা চলে, চা খেতে খেতে খোসগল্প করতে করতে। তারই ফলে ড্রাব. ডাল, দামোদর-ভ্যালির ডকুমেণ্টারী হয়ে গেছে পঞ্চতপা। অসিত সেন যেন ইচ্ছে করেই এই ইনসেন গল্প নির্বাচন করেছেন প্রমাণ করাবার জন্য যে যেমন তেমন গল্প নিয়েই তিনি এমন ছবি করতে পারেন। বাঁদর গড়বার মাল মশলা নিয়ে বসে শিব গড়ে দেখানোর বাহাদুরী অতএব তাঁর অনস্বীকার্য প্রাপ্য। তাছাড়া আরেকটা কথা। গল্পের কাহিনীকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যত ভালো গল্পই লিখুন, নামের কল্যাণে তাঁকে চিরকাল অঙ্কলেখকই মনে হবে, গল্পলেখক মনে করা সহজ স্বাভাবিক হবে না। সেক্সপীয়র যতই বলুন নামে এসে যায় না,—নামে কিন্তু এসে যায়। ঢোল পদবী সম্বল করে সিরিয়স কবিতার লেখক হওয়া শক্ত, ঢোল পদবী কবিতার শীর্ষ অথবা পাদদেশে হাস্যোদ্রেক করতে বাধ্য!

॥ কুশী-লব ॥

অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায় যতখানি স্কোপ পেয়েছেন রায়স্কোপে ততখানি কেউ একা পায় না, তবে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তবে তাঁর অভিনয় কোথাও একথা বলবার স্পর্ধা রাখে না যে আর কাউকে দিয়ে এ অভিনয় অসম্ভব, যেমন রাখেন তৃপ্তি মিত্র যখনই যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তবে যেদিন অরুন্ধতি তা পারবেন সেদিন সিদ্ধি আসবে তাঁর। সে সিদ্ধি আসা একবার অসম্ভব নয়। অসিতবরণ অভিনেতা হিসাবে সাধারণতঃ অচল। প্রতিশ্রুতিতে গাঁইয়া বোকা বোকা চেহারার চরিত্রে তাঁকে অসম্ভব মানিয়েছিল। তারপর ভালো অভিনয়ের কোনও প্রতিশ্রুতি এ পর্যন্ত তাঁর অভিনীত চরিত্রের তালিকায় বিরল। কিন্তু পঞ্চতপায় তাঁর অভিনয় রসোত্তীর্ণ। কিন্তু প্রেমিকের অভিনয়, ইঞ্জিনীয়র হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব

বিশ্বাসযোগ্য নয়। শুক্লা বলে যে মেয়েটি নেমেছে অসিত সেনের হাতে পড়েও সে কাঠের পুতুল মাত্র হয়েই দাঁড়িয়ে আছে সারা ছবিতে।

॥ Summing Up ॥

অসিত সেন প্রশংসায় ইনসেন না হয়ে গেলে তাঁকে দিয়ে বাংলা ছবির কোনও কোনও অভাব নিশ্চয়ই দূর হবে। এবং তাই বা কম কি? নাই বা হলেন তিনি সত্যজিত রায়। রাত্রে সূর্যর জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে অন্তত টর্চবাতির আলো অনেক, অনেক বেশি আশাপ্রদ।

॥ পাশাপাশি ॥

উত্তর মেরু !

মেরুপথের যাত্রীদল :

পরিমল গোস্বামী

অভিযান-কাহিনী পাঠের আগ্রহ যাঁহাদের আছে এ পুস্তক পাঠে তাহাদের অতৃপ্তি ও বিরক্তিই ঘটিবে। কারণ কাহিনীটিতে যাত্রা ও ঘটনার রসোত্তীর্ণ বর্ণনা কোথাও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

আনন্দবাজার

রবিবার ২।৬।৫৭

দক্ষিণ মেরু !

মেরুপথের যাত্রীদল :

পরিমল গোস্বামী

আজ বাংলা ভাষায় একান্ত দরকার কিশোরদের জন্যে সত্যনিষ্ঠ এই রকম প্রাণবন্ত রসোত্তীর্ণ রচনা।

যুগান্তর

রবিবার ২।৬।৫৭

প্রকাশ্যে !

॥ মাটি-ঘেঁষা মানুষ ॥

মানিকের রচনাপদ্ধতি সুধীরঞ্জন এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন যে দুই লেখকের লিখিত অংশ চিহ্নিত করা পাঠকসাধারণের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

বিজ্ঞাপনের কথা।

নেপথ্যে !

॥ মাটি-ঘেঁষা মানুষ ॥

সুধী পাঠক মাত্রেই দুই লেখকের লিখিত অংশ হয়তো চিহ্নিত করতে পারবেন। তাই সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিনা।

প্রকাশকের কথা।

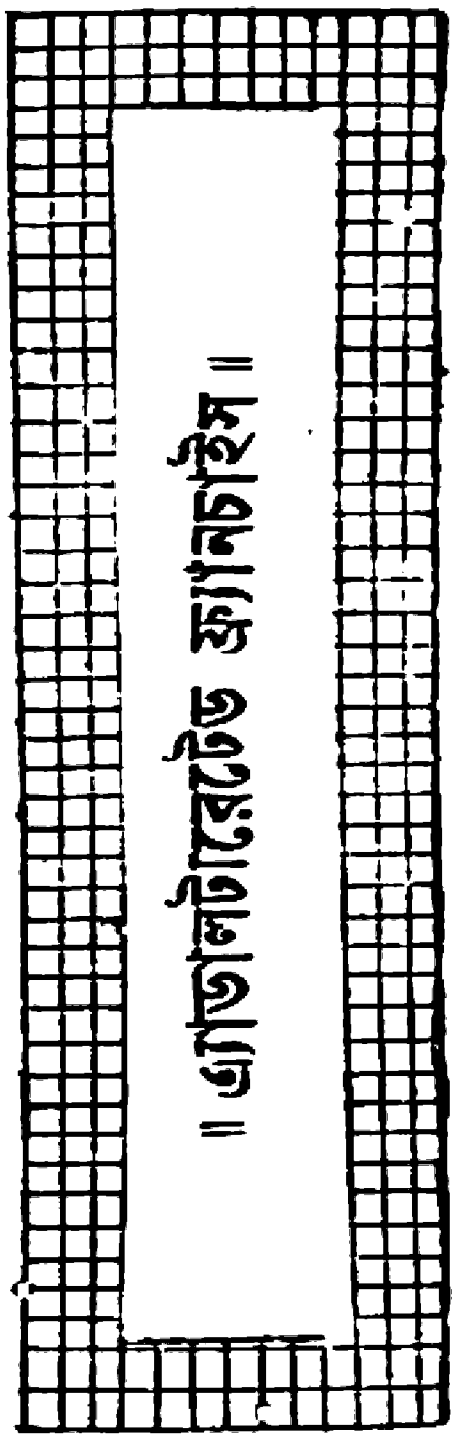

॥ এক ॥

মণের দামের বাঁয়ে ইলেক মাত্র দিলে আধ পোয়ার দাম নাকি এককালে মিলত। টাকায় ইলেক মানে গণ্ডা। কিন্তু এখন মাগ্‌গী গণ্ডা আছে, কড়া-গণ্ডার এযুগে নো পাত্তা ; তাই ইলেক দেওয়ার কোন মানেই হয় না আর টাকার সঙ্গে।

টাকার সঙ্গে যা' জুড়ে—কিংবা বরঞ্চ, যার সঙ্গে টাকা জুড়লে—একটা কিছু সলিউশনের ভরসা এযুগে করা চলে. তা হচ্ছে ইলেক নয়. ইলেকশন। ইলেকশন প্লাস টাকা ঠিক কায়দা বুঝে লাগাতে পারলে আধ পোয়া কেন

নারায়ণ দাশ শর্মা

পুরো চার পোয়ার হিল্লে হয়ে যেতে পারে আজকাল। পোয়া-বারো হওয়াও কিছু অসম্ভব না। আখছার হচ্ছে তো দেখতে পাই।

ইণ্ডিয়া ম্যাট ইজ ভারত এখন দুনিয়ার সবচে বড় গণতন্ত্র। দুসরা নম্বর গণতন্ত্র আমেরিকার চাঁই ব্যক্তির মুখ থেকে একথা শোনার পরও তাদের এবিষয়ে কোন সন্দ ছিল, এই ১৯৫৭ সালের দুসরা নম্বর ইলেকশন দেখবার পর তারা এখন তোব্যা তোব্যা!

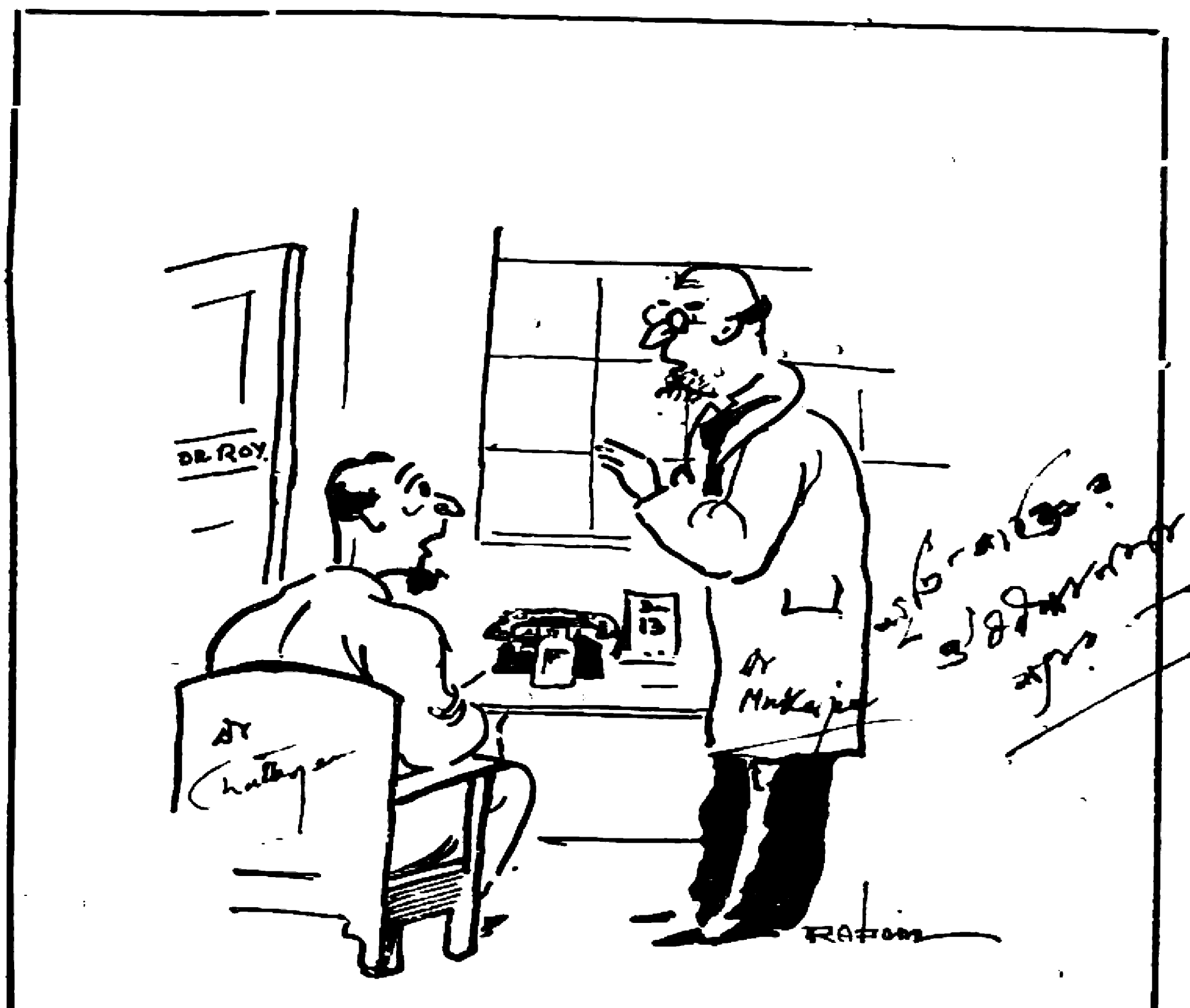

—এই রে ! লোকটা স্মৃতিশক্তির ওষুধ নিয়ে ফি না দিয়ে চলে গেল—

—লোকটার নাম কি ?

—ঐ যাঃ ! আমিও ভুলে গেলাম যে লোকটার নাম—!

॥ অচলপত্র ॥ ॥ রবীন ॥

করছে সব। সেই তোব্যাকরণের তোবৈয়াকরণের দল বেঁচে থাকলে—এ আর কী দেখল—এর চেয়েও বড় ব্যাপার দেখতে পাবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। কেন না ১৯৫২ সালে ভোটার ছিল ১৭½ কোটি মোটে, এবারেও সাকুল্যে ১৯½ কোটির ওপরে ওঠেনি লিষ্টি ; ১৯৬২ সালে যে তা ২৫ কোটিতে পৌছবে না তা কে বলতে পারে ? এখনো পর্যন্ত আদ্দেক কাশ্মীর আমরা মোটে গিলেছি কিন্তু হজম করতে পারি নি, তবু ঈশ্বর সাক্ষী আমাদের কনষ্টিটুশনের দলিলে পষ্টাপষ্টি ছাপার হরপে গোটা কাশ্মীর আর জম্মুর নাম লেখা আছে—আর পাঁচ বছরেও কি বড় আদালতের মামলায় ডিক্রী পাব না আমরা ? দরকার হলে পাঁচশ চুরানব্বুই ঘণ্টা এক নাগাড়ে বক্তৃতা করতে পারে না আমাদের কেষ্টো উকিল ? তারপরে পূব বাঙ্লায় এখনও হিন্দু রয়েছে না ক্রোড়খানিক, কালে কালে তাদের সবার নামই তো আমাদের ভোটের লিষ্টিতে আসবে ! সবচে বড় কথা হচ্ছে মা ষষ্ঠি তো আর চুপ করে বসে নেই একটি দিনও।

অবশ্যি জন্মের লিষ্টি থেকে ভোটের লিষ্টিতে আসতে কটা বছর সময় লাগে এখনো। কিন্তু ১৯৫৭ সালে লাগে বলেই যে ১৯৬২ সালেও তা লাগবে এর কোন মানে নেই। তখন হয়ত নিয়ম হবে যে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ভোট দিতে পারবে। এমনকি পোলিং আওয়ারের মধ্যেই হয়ত জন্মাতে পারবে এই আশায় অজাত কোন নাগরিকও যে টেণ্ডার ভোট অন্তত দিতে চাইবে না একথাও জোর করে বলা যায় না। কেননা, একুশ বছরের যে নিয়মটা এখন এদেশে রয়েছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, একেবারেই আরবিট্রারি নিয়ম এটা। এ নিয়ম চিরকাল ছিল না, চিরকাল থাকবে একথা মনে করারও কোনি কারণ নেই।

আসলে এই একুশে আইনটা এল কোথেকে—না বিলেত থেকে। সে দেশে যে করেই হোক ধরে নেওয়া হয়েছে একুশ বছরে মানুষ adult হয়। কিন্তু পৃথিবীর এই বৃহত্তম ডেমোক্রেজী ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত. এই আমাদের দেশে ও নিয়মটার কী মানে হতে পারে ? যে দেশে একুশ কেন একাশি বছরেও কেউ adult হয় না সেখানে কেন এই একুশে আইন ? যে দেশের অধিবাসী হল কয়েক কোটি শিশু আর সেই শিশুদের হাজার কয়েক গার্জেন

অর্থাৎ শিশুপাল সে দেশে adult franchise কথাটা কোন দেশী ঠাট্টা ?

কিন্তু না, ঠাট্টা করবে কে ? যে শিশুপালের দল পোষ্টার দিতে পারে 'সকলের ভোটের অধিকার দিয়েছে কংগ্রেস, কংগ্রেসকে ভোট দিন।' আহা, তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার সে-আঁখি তোমারি হোক !) তারা এমন একটা উচ্চশ্রেণীর রসিকতা করবে একথা ভাবা যায় না। Adult franchise কথাটা humour হতে পারে না, বরঞ্চ abbreviation হওয়া সম্ভব : পুরো কথাটা হয়ত Adulterated Franchise—ভ্যাজাল ভোটাধিকার !

ভ্যাজাল ছাড়া কি আর বলা যায় বলুন। আগের দিনের পুরানো মালের ছিল যেমন দাম তেমনি গুলুষ, আর এখন ? খুচরো কিনতে গেলেও এক টাকা পাঁচ সিকেতে মিলে যায় একটা ভোট, পাইকারী দরে তো যে কোন ক্লাব সমিতিতে দুশো টাকা দাদন দিলে পাঁচশ ভোটের রফা হয়ে যায় পাঁচ মিনিটে, আর কেনা বেচার লাইনে না গিয়ে যাঁরা ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে কারবার করেন তাদের পড়তা দর যদি শোনেন, বিশ্বাস করতে পারবেন না কেউ। ভ্যাজাল, ভ্যাজাল ভ্যাজালের যুগ পড়েছে আজকাল :

॥ দুই ॥

অতীতের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পাওয়া বন্দীকে যখন বেছে নিতে বলা হত তপ্ততৈল কটাহ, মত্তহাতিঙ্গ পদতল, শানিতশীর্ষ শূলদণ্ড ইত্যাদি কয়েকটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার যে কোন একটিকে, তখন এই পন্থা-নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে সম্মানিত করা হত না। কেননা, এযুগের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সঙ্গে ওটার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ওর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার মোটামুটি মানে বেচারা বন্দী তখন বুঝতে পারত ; কিন্তু এ যুগের জোড়া বলদ, খোড়ো ঘর আর কাস্তে-শীষের মোটামুটি মানে বুঝতে পারে উনিশ কোটি বন্দীর মধ্যে কজনে ? উপরন্তু ফুটন্ত তেল কোন দিন মেনিফেষ্টোতে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি দ্রুততম সমাপ্তির, দুরন্ত হাতী বক্তৃতায়-পোষ্টারে জানায়নি মহত্তম মুক্তির আমন্ত্রণ। খাঁটি গণতন্ত্রে কন্‌ফিউশন তাই অনেক বেশী।

এক পিঁয়াজ চোরকে কোন রসিক বিচারক শাস্তি দিয়েছিলেন, হয় একশ টাকা জরিমানা, নয়তো একশ ঘা বেত,

কিংবা একশটা পিঁয়াজ এক নাগাড়ে খাওয়া। বেচারা প্রথমে সহজ ভেবে শেষের শাস্তিতে রাজী হয়েছিল, নাকের জলে একসা হয়ে তারপর বেতের ঘা নিল পিঠ পেতে; অতঃপর ঘা কতক খেয়ে বুঝল জরিমানা দেওয়া ছাড়া তার উপায় নেই আসলে।

আমরা পাঁচ বছর ধরে পিঁয়াজ খাবার চেষ্টা করে দেখেছি প্রথমে। ত্রিবাঙ্কুর কোচীন মাঝখানে একবার মরীয়া হয়ে বেতের এক্সপেরিমেণ্টও করেছে ১৯৫৪-৫৫ সালের মাস দশেক। এবারে সেখানে পছন্দ বদল করে হয়ত খেসারত দেওয়াই ঠিক করেছে কেরালার জনগণ। পৃথিবীর নিরক্ষরতম গণতন্ত্র ভারতবর্ষের শিক্ষিততম রাজ্যে সংশোধিত মার্কসীয়-লেনিনীয় মাওসেতুঙীয়-ঝানভীয়-নাম্বুদিরিপাদীয় পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেজীর ডিম ফুটে কোন নয়া গণতন্ত্রের শাবক এবারে বেরোয়, দেখা যাক!

কিন্তু ডিমটি আসলে ফুটবে কিনা শেষ পর্যন্ত তাই তো বোঝা যাচ্ছে না এখনো। বলা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট কোকিলের এই বহুমূল্য প্রসবটিকে তা' দিতে হবে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী কাকেদের; নয়াদিল্লীর নয়া পয়সার তাপ উপযুক্ত মাত্রায় না পাওয়া গেলে কী করে ফুটবে তা? কী দিয়ে হবে প্ল্যাণ্টেশন-কুঞ্জ সংবিধান-সম্মত জাতীয়-করণের বৃহৎ যজ্ঞ?

তবু কেরালা যা দেখাল তা দেখবার যোগ্য বটে। মন্ত্রীদের মাইনে কমানোটা যদি ষ্টাণ্ট হয় তো এ ষ্টাণ্ট প্রতি রাজ্যে এবং কেন্দ্রে দেখলে আমরা খুশী হতাম। দশজন ফাঁসির আসামীর প্রাণ রক্ষা যদি 'অবিবেচনা'র কাজ হয়ে থাকে তো ধর্মবাঁধ কোলিয়ারী মামলার সাধন গুপ্তের ফাঁসির মত সুবিবেচক সুবিচারের চাইতে এই অবিবেচনা মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে স্পর্শ করবে বেশী। কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকার কর্ম্যুনিজম কেন সোসালিজমেরও ত্রিসীমানায় ঘেঁষবার দুঃসাহস করতে যাচ্ছে না এ স্বীকারোক্তি যতটা সম্ভব সাদা কথায় করার পরেও তাই ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পালঘাট কংগ্রেসের খিচুড়ি-থিসিসের প্রধান প্রবক্তা কমরেড শঙ্কর নাম্বুদিরিপাদকে ফিকে গোলাপী সেলাম জানাই আমরা।

আর সমবেদনা জানাই প্রথমে পট্টম থানু পিল্লাইকে যিনি মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেও আশ্বাস দিয়েছিলেন পি. এস. পি.—কংগ্রেস কোয়ালিশন

সরকার গঠনের নেতৃত্ব করতে তাঁর উদার সম্মতি জানিয়ে (বেচারী পি. এস পি—কেরালা আর উড়িষ্যা ছজায়গাতেই তারা কোয়ালিশনের জন্যে হাত ধুয়ে বসেছিল প্রো: কংগ্রেস এবং এন্টি কংগ্রেস ডায়ালেকটিক্সের কৌতুকজনক থিয়োরীতে!) দ্বিতীয়তঃ আর-এস্-পি'র টি কে. দিবাকরণকে—বারোটি আসনের ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট-দের সঙ্গে ঐক্য চলে না বলে সাতাশটে লড়তে যাওয়ার অবিমৃষ্যকারিতার দাম একটু বেশীই দিতে হল (১৯৫২তে কেরালায় আর. এস. পি ঐক্য করল, বাংলায় করল না; ১৯৫৭তে তার ঠিক উল্টো—চারটে অঙ্কই ভুল হিসেবের ট্র্যাজেডী!) আর সর্বশেষ সহানুভূতি হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য রামকৃষ্ণ রাওকে—রণদিভে ব্র্যাণ্ড সি. পি. আই যাঁকে তেলেঙ্গানায় ঘোল খাইয়েছে সবচেয়ে বেশী, কেরালার রাজ্যপাল হয়ে তাঁকেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কনষ্টিটুশনাল রুলার হয়ে কম্যুনিষ্ট পলিটব্যুরোর উপদেশ মেনে চলতে হচ্ছে! রামকৃষ্ণ রাওকে যাঁ আত্ম-সংযমের তপস্যা করতে হচ্ছে, রামকৃষ্ণ পরমহংসকে সম্ভবতঃ তার অর্দ্ধেক করতে হয়নি। অথচ তাঁর কাতর অনুরোধ নয়াদিল্লী এখনও শুনছে কিনা কে জানে!

কেরালার রাজ্যপাল যদি অন্যত্র বদলী হতে না পারেন তো ১৯৫৭ সালের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করবেন। এবং সেই পদত্যাগের চাইতে চমকপ্রদ কোন সাফল্যের আশা রাখে না কমরেড নাম্বুদিরিপাদ। স্নায়ুযুদ্ধে এ জয়লাভের গুরুত্বও কম নয়।

॥ তিন ॥

পশ্চিমবঙ্গে যখন নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে এবং কেরালার নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছে, তখনও পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব কেরালার চাইতে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার গঠনের সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছেন বেশী। এর কারণ যদি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের রাজনৈতিক মূর্খতা বলি তবে অর্ধসত্য বলার অপরাধ হবে আমার। কেননা পলিটব্যুরো যেমন কেরালায় নিরঙ্কুশ মেজরিটির স্বপ্নও দেখেনি, তেমনি পশ্চিম বঙ্গেও কংগ্রেসের পতনের আশা কিছু আর সীরিয়াসলি করেনি। তবু যে প্রোপাগাণ্ডার জন্যেও পাল্টা সরকার গঠনের শ্লোগান তাঁরা পশ্চিম

বঙ্গে দিয়েছিলেন তার কারণ হচ্ছে সরকার গঠনের চাইতে 'বামপন্থী ঐক্য' তাঁদের বেশী দরকার মনে হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে ঐক্যের জন্য তাঁরা একটুও স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত ; না. ভাববাদী দর্শনে তাঁদের আস্থা নেই—প্রাক্টিক্যাল পলিটিক্সে তাঁরা হেগেলীয়ান ন'ন, পুরোপুরি মার্ক্সিষ্ট লেনিনিষ্ট।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই : নেতিমূলক ভোট কুড়িয়ে সরকার গঠন বরং সহজ কিন্তু পেছনে সাংগঠনিক জোরের পাওয়ার হাউস না থাকলে সে সরকারকে ততদিন টেঁকান অসম্ভব যতদিনে ইন্টারন্যাশনাল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের খুঁটোর জোরে বিনা রেভলিউশনে নয়া গণতন্ত্রের স্বর্গে পৌছোন চলে। সি. পি. আই সাংগঠনিক শক্তিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্টি এই myth কতখানি সত্যি তা সি. পি. আই জানে সবচেয়ে বেশী। এর নেতৃত্ব ক্লিক ফ্যাকশন-কোটেরীতে জর্জর, এর র‍্যাংক;এণ্ড-ফাইল অস্পষ্ট মতবাদের ধোঁয়াটে নেশায় আবেগ-বিহ্বল পেটি বুর্জোয়া অস্থির-চিত্তদের সংখ্যাধিক্যে বিপজ্জনক। তাই কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম প্রয়োজন বৃহত্তর সংগঠনের—মিলিট্যাণ্ট পার্টি নয়, মেজর পার্টি। এইজন্য দরকার কংগ্রেস ছাড়া আর সকল পার্টির লিকিউডিশন : কংগ্রেস না কম্যুনিষ্ট এই ডায়লেমার মুখোমুখি সমস্ত দেশকে দাঁড় করানো দরকার অবিলম্বে। সেই লিকুইডিশন শত্রুতা দিয়ে করতে যদি লাগে দশ বছর, মিত্রতা দিয়ে করার আশা রাখে তারা দুবছরে। ঐক্যের অস্ত্রে নিঃশব্দে নিঃশেষ করেছে তারা এমনি করে অরুণা আসফ আলি এবং তাঁর লেফ্‌ট সোস্যালিষ্ট পার্টিকে, মহারাষ্ট্রের মোরে এবং তাঁর উপদলীয় পি ডব্লিউ-পি'কে, উত্তর প্রদেশের ঝাড়খণ্ডে রায় এবং ইউ-পি-আর এস-পি'কে। স্বর্গতঃ সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী মারা গিয়ে এডিয়েছেন এই অক্টোপাসের আঁটুনি কিন্তু মার্ক্সিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের কথানা হাড় ইতিমধ্যেই ভেঙেছে কে জানে? কেরালার কে-এস্ পি বন্ধুর আলিঙ্গনে যত সত্বর নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আর-এস্-পি বোধ হয় নির্বাচনী মার খেয়েও তত সহজে মুছে যাবে না কুইলনের শ্রমিক আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি থেকে।

বামপন্থী ঐক্যের সরকার গঠনের তাই—ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির এত গরজ। একদলীয় সরকার গঠন কম্যুনিষ্টদের কাছে একটা প্যারা

ডাইসের মত, কেননা নিরঙ্কুশ শাসন-ক্ষমতা হাতে পাওয়া মানেই হচ্ছে তাদের মতবাদের বৃহৎ ছিদ্রগুলো জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। কেরালায় সংবিধান এবং কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া আর কোন স্কেপগোট পাওয়া যাবে না নিজেদের ত্রুটিগুলি ঢাকতে—পি-এস্-পি যদি নাম্বুদরিপাদের উদার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করত তবে সুবিধা হত একটু। তবু কেরালা একটিমাত্র রাজ্য – গোটা পলিটব্যুরো এবং পার্টি সেখানে প্রচার দিয়ে সামলাবার আশা রাখে কাজের অভাব। কিন্তু আর কটি রাজ্য যদি কেরালার পথে যায় তবে কংগ্রেসের সঙ্গে মৌলিক কোন পার্থক্য দেখাতে পারবে তো কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া?

[বস্তুতঃ কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আইয়ের ট্যাক্‌টিক্যাল গরমিল যতখানি প্রকট, নীতিগত মিল জন-সমক্ষে তত প্রকট না হলেও সত্য। পররাষ্ট্র নীতিতে এই দুই পার্টির তফাৎ এক নয়া পয়সার চাইতেও কম—বোম্বেতে কৃষ্ণ মেননের নির্বাচনে বামপন্থী সঙ্কটের সময় তা সকলে টের পেয়েছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কেও (-স্বর্গতঃ ডাঃ মেঘনাদ সাহা বেঁচে থাকলে যা নিয়ে এত বড়াই করতে কংগ্রেস পেরে উঠত না)' সি-পি-আই প্রায় ব্ল্যাঙ্ক চেকে সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যান্য নীতিমূলক প্রশ্নের তুলনামূলক বিচার ক্রমশঃ প্রকাশ্য।]

কাজেই কেরালা আজ কম্যুনিষ্ট পার্টির শুধু গর্বের বস্তু নয়, আশঙ্কার বস্তুও। সেই সঙ্গে সমস্ত বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যতও কেরালার নারকেল আর কাজুবাদামের বাগানে সঞ্চিত; কেন না, কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি কেরালায় মার খায় তবে সে মার দ্বিগুন জোরে লাগবে ভারতের সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনের মাথায়।

॥ চার ॥

বামপন্থী আন্দোলনের আশার আলো যদি কেউ দেখিয়ে থাকে তো সে কেরালা নয়, কোলকাতা। কেরালায় কম্যুনিষ্ট পার্টি সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেয়েছে—কিন্তু কতজন ভোটারের সমর্থন আছে সেই সরকারের পেছনে? শতকরা মাত্র সাড়ে ছত্রিশ। অথচ তার চাইতে বেশী অনুপাতে ভোট পেয়েছে কলকাতায়। কংগ্রেস প্রার্থীরা,—মোট কাষ্ট করা ভোটের শতকরা সাড়ে

চল্লিশ ভাগ। ১৯৫২র নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ৪১·৬%, সমস্ত বামপন্থী প্রার্থীরা একসঙ্গে ৪৪%। অথচ সেবারে আসন সংখ্যার ৬০% পেয়েছিল কংগ্রেস। বামপন্থীরা এবারে ভোট পেয়েছে শতকরা ৫২·৪% আসন পেয়েছে প্রায় ৭০%। অর্থাৎ ভোটের অনুপাত ৮·৪% বাড়িয়ে আসন সংখ্যা ৩০% ভাল করেছে বামপন্থীরা। কংগ্রেসের ভোটের অনুপাত কমেছে ১% মাত্র কিন্তু আসন কমেছে ১০%।

এই থেকে বোঝা যাবে ভোট ভাগাভাগির ফলে সংখ্যালঘুর ভোট পেয়ে জয়লাভের যে মওকা কংগ্রেস ১৯৫২ সালে কলকাতা সহরে পেয়েছিল এবারে তা আর হয়নি। যদিও সম্পূর্ণই নিজেদের দলীয় স্বার্থের প্ররোচনায় কম্যুনিষ্ট এবং পি. এস. পি এই ঐক্য গড়েছিল, তবু ফলাফল বিচারে এই দুই দলকে এজন্য ধন্যবাদ জানান উচিত।

একথা সত্যি যে কলকাতায় কংগ্রেসের যতটুকু নৈতিক পরাজয় ঘটেছে, তা সুদে আসলে পুষিয়ে নিয়েছে মেদিনীপুর এবং অন্যান্য মফঃস্বল এলাকা। তবু কলকাতায় কংগ্রেসের পরাজয়ের অর্থ হল কংগ্রেসের অন্দরমহলে ডাঃ রায়ের ক্ষীয়মান আধিপত্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত—যার ফলে ডাঃ রায় আগামী পাঁচ বছরে গত পাঁচ বছরের মত গোঁয়ার্তুমি করার সাহস করবেন না আর কিছুতেই। উনি যখন কলকাতার ভোটারদের frustrated বলেছিলেন, তখন সম্ভবতঃ কলকাতার কংগ্রেসী মহলের কথাই বিশেষ করে ভাবছিলেন। বস্তুতঃ এ নির্বাচন দাম্ভিক-শ্রেষ্ঠ ডাঃ বিধানচন্দ্রের মোহমুদ্গর হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ফল বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে আমরা বারান্তরে করব।

* * *

কিন্তু কী ফায়দা হবে সেই বিশ্লেষণে! সংখ্যাতত্ত্বের ভোজবাজী দেখিয়ে আমরা পাতার পর পাতা গবেষণা করব, ভবিষ্যৎ-বাণী শোনাব ১৯৬২ সালে কী হবে—তারপর আবার সংখ্যাতত্ত্ব আবার বিশ্লেষণ, কেন আমাদের ভবিষ্যৎ বাণী মিলল না একটুও, তারই কৈফিয়ৎ শোনাবার জন্য আবার পাতার পর পাতা গবেষণা —কী ফায়দা হবে তাতে? যে নির্বাচনী নিয়মে ভোট মাথাগুণতিতেও হয় না, কেন না পোলিং ষ্টেশনে ভোটারকে মাথা আছে কিনা দেখাবার দরকার নেই—শুধু বাঁ হাতের তর্জনীর আঙুল থাকলেই ব্যালট পেপার

পাওয়া যায়; যে নির্বাচনী নিয়মে একুশ বছর বয়স হওয়াই যথেষ্ট—তা সে হামাই দিক, কি আঙুলই চুষুক; যে নির্বাচনী নিয়মে সিংহের চামড়া গায়ে ভোট বৈতরণী পার হয়ে পরে কাঁধে জোয়াল নিয়ে আবার জেতা যায়; সেই adulterated franchise সেই democracy, সেই সার্কাসপার্টি সমূহের চমকপ্রদ কীর্তি-কলাপ সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ, কোন গবেষণা, কোন ভবিষ্যৎ বাণী যদি কেউ করতে পারেন—তো সে দ্বারেশচন্দ্র শর্মা। এ শর্মার কর্ম নয় তা।

মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী

'দেশে দেশে চলি উড়ে'—দিলীপকুমারের বই।

—দিলীপবাবুকে তো আমরা বাঙালী বলে জানতাম।

মনোজ বসু জার্মানী গেছিলেন বলে বসু মহাশয়ের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা যাঁরা বিচলিত বোধ করছিলেন তাঁদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে তাঁর জার্মান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জার্মানী যাবার পূর্বেই তিনি পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিটি প্রেসে দিয়ে তবে গেছিলেন।

আনন্দবাজারে (পনেরই জৈষ্ঠ্য) প্রকাশিত, 'সিপাহী বিদ্রোহ ও সমসাময়িক ফিরঙ্গী উপন্যাস'-এ পড়ছি :

"ভারতে ইংরেজ শাসনের শুরু ১৯৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের পরে।"

—১৯৫৭-য় ? ২,০৫৭-য় হবে না ?

॥ ফ্র্যানচাইস ॥

রবিবার ছুটির বার, কিন্তু আমার কাছে রবিবার ছুটিবার নয়। বরং ছুটোছুটি করে বেড়াবার বার। পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়ান আরম্ভ হয়ে যায় যেই রেডিওতে সঙ্গীত শিক্ষার আসর বসে। না। তার আগে থেকেই, অনেক আগে থেকেই। প্রথম কাপ চায়ের সঙ্গে বাজারের কাগজের রবিবারের বিশেষ অমৃত পরিবেশন যখন সাপ্লিমেন্ট আকারে হাতে এসে পড়ে তখন থেকেই। হেমেন্দ্র কুমার রায় একবার বলেছিলেন

॥ রবিবারেও রেহাই নেই ॥

যে চা বড় ভাল জিনিষ, হাতে গরম ঠেকে বটে কিন্তু খেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়'। 'কিন্তু আজকের দিনে রবিবারের সাময়িকী চায়ের সঙ্গে যদি কারুর হাতে পড়ে তা'হলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে কিন্তু মাথা গরম না হয়ে

॥ কল্যাণ ভট্টাচার্য ॥

উপায় কি ? Second thought-এ ভগবানের অবিচার সম্বন্ধে আপনার আরও একটি অভিযোগ বাড়বে মাত্র। তা হচ্ছে, 'কেন আমায় নিরক্ষর করলে না প্রভু, তা'হলে তো ক-অক্ষর গোমাংস বিশিষ্ট এই সাহিত্য-সভার কবল থেকে রেহাই পেতুম !'

বাজারের কাগজ যখন সাহিত্য করে তখনই আমার দ্বারিক ঘোষের খাবার ঘরে টাঙান বিবেকানন্দের বাণী চোখের ওপর জ্বলে ওঠে, চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কার্য হয় না। এমনই রবিবাসরীয় আসরগুলি পৃথিবী জুড়ে সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার চরম ক্ষতি করছে; তার ওপর আমাদের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এত অক্ষম এবং ক্ষতিকর সম্পাদনায় সর্বনেশে যে ক্যালেণ্ডার থেকে রবিবার দিনটা বাদ না দিলে, বরবাদ না করলে, "এ বদ বঙ্গ রোধিবে কে ?"

ক্রিশ্চানদের কাছে রবিবার হচ্ছে বিশ্রামের আর গীর্জায় যাবার দিন। চাকরেদের কাছে রবিবার ছুটির বার, ছাত্রদের কাছে রবিবার ছবিবার। সিনেমাওয়ালাদের কাছে রবিবার 'হাউস্ ফুল' ডে! আর দৈনিক পত্রের পক্ষে রবিবার দেশের এবং দশের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাবার অদ্বিতীয় হাতিয়ার। রবিবারের সাময়িকী বলে যে পাতা কটি, অতিরিক্ত পাতা কটি খবরের কাগজের অঙ্গে জুড়ে দেওয়া তার তুলনা চলে একমাত্র গোদের ওপর বিষফোঁড়ার সঙ্গে। বাংলা দৈনিকপত্র ভাষা এবং অঙ্গসজ্জার অপরাজেয়ে একেই মা মনসা, তার ওপর এই ম্যাগাজিন সেকসন রবিবারে-ধুনোর গন্ধ। এবং বাংলা দেশে যেমন টাকা পেলে টয়লেট পেপারে লিখতেও কোন সাহিত্যিকের সম্মানে বাধে না, তেমনিই টাকা পেলে অথবা না পেলেও শুধুমাত্র সার্কুলেশনের ভিত্তিতে নামের ভিত্তি স্তম্ভ সুদৃঢ় হবে এই আশায় রবিবাসরীয়র সাহিত্য তামাশায় যোগ দিতে বাদ নেই ঘোষ-বোস বন্দ্যোঃ-মুখোঃ-গঙ্গোঃ কোনও কেষ্ট-বিষ্টুরই !

রবিবার আমার কাছে তাই সেই মুহূর্তেই বিষ হতে আরম্ভ করে যেই রবিবাসরীয় সাময়িকী করে চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ। সমস্ত দিনটা নষ্ট হবার পর হিসাব করতে বসি আজ কার মুখ দেখে উঠেছি ? এবং তখন মনে পড়ে 'প্রভাতে উঠিয়া যে মুখ হেরিনু' তা হচ্ছে বাংলা দৈনিক। এবং দৈনিক একই দুর্গন্ধময় জিনিষের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। রঞ্জি ষ্টেডিয়াম একদিন সম্পূর্ণাংগ হলেও হতে পারে, কিন্তু এ দেশে প্রাথমিক স্তরের সাংবাদিকতা চালু হবার আশা মরীচিকাও নয়, এতই সুদূরপরাহত। গল্প আছে, একবার এক বাচাল

ছেলেকে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলা হলে সে নাকি অবিচলিত উত্তর দিয়েছিল—টর্চ জ্বেলে দেখে নেব। বাংলা দৈনিক সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করতে পারলে সুখী হতাম, এমনই উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় ভাস্বর আমাদের সংবাদপত্রের ভবিষ্যত! কাগজ থেকে খবর যে কতদূরে তা বিশ্বাস করা শক্ত বাংলা খবরের কাগজ না দেখলে।

Fleet street can make and unmake Downing street!—আপাতস্পর্ধিত কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান এ মন্তব্যর পুনরুক্তি করতে শ্রীচপলা কান্তেরও বিবেকে বাধবে বলে বিশ্বাস। 'উল্টো বুঝলি রামের দেশ'-এ সবই উল্টো—নয়াদিল্লী ছুটতে হয় বাগবাজারকে। কেন, বাঘে ছুঁলে আঠার ছেড়ে একশো আঠার ঘা বলে? বাংলা কাগজের পতনের সংগে যে অধ্যায় সূচিত হয়েছিল তা আজ বিসূচিকার চেয়ে ভয়াবহ, এমন বিষে জর্জর যে স্বয়ং নীলকণ্ঠও বোধ হয় গলাধঃকরণে অপরাগ হতেন। যে বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যেও এহেন কৃতবিদ্য পুরুষদের কৃতিত্ব এক কথায় বলা অসম্ভব, সেটি হচ্ছে Bull in a china shop! ধর্মের নয়, অধর্মের! কখনও কখনও bull-এর বদলে এরা সেই বুলবুলি, যাদের শেখালেও They talk shop.....!

মেরুদণ্ড বিবর্জিত এবং অবিজ্ঞাপিত কিন্তু সর্বজনবিদিত এই পাটি পেপারগুলোর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব কিন্তু রবিবারের ক্রোড়পত্রে নিহিত। 'ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকপত্র সমূহের মধ্যে সর্বাধিক (দাগটা আমাদের দেয়া নয়) প্রচারিত পত্রিকা' আনন্দবাজার এবং অনুরূপ পাঠকপুষ্ট যুগান্তর, প্রতি রবিবার মূল কাগজের সংগে যথাক্রমে বার করেন 'রবিবাসরীয় আলোচনী' আর 'যুগান্তর সাময়িকী।' অগ্রজ প্রেমের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ বসুমতী, লোকসেবক, স্বাধীনতা ইত্যাদি 'রবিবারেও রেহাই নেই' জেহাদে যোগ দিয়েছেন। দৈনিক কাগজের সাহিত্য রস পরিবেশনকারী ক্রোড়পত্র প্রকাশনার বিরুদ্ধে সাময়িক পত্র পত্রিকার তরফ থেকে যে অনুচ্চারিত অভিযোগ আছে, তা বিশ্বব্যাপী এবং নিছক সাম্প্রতিক নয়। Braille না জেনেও যে কোন অন্ধ বলতে পারে যে এই সাহিত্য বাসর সাময়িক পত্রিকাগুলোর স্বার্থ যথেষ্ট ক্ষুণ্ন করে। বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির অশেষ সারবত্তার জন্যে এ অভিযোগ মূলতঃ অভিমানপ্রসূত, অনুযোগ নয় শুধু।

প্রকাশনার যৌক্তিকতার কথা বাদ দিলেও রবিবাসরীয়-সম্পাদনা অতীব আপত্তিকর। 'সেকেণ্ড যায়, মিনিট যায়, ঘণ্টা যায়, দিন যায়, মাস যায়, ঋতু যায়, বছর যায়, শতাব্দী যায়,' (যুগান্তর সাময়িকী : পয়লা বৈশাখ) কিন্তু যুগান্তর গোষ্ঠীর অত্যাশ্চর্য মুর্খামীর যুগাবসান হয় না। দশ পয়সার বদলে বৃহত্তর পাঠকবর্গের জন্য সাহিত্য পরিবেশন এঁদের ulterior উদ্দেশ্য। কিন্তু এ চৈতন্য রহিত যে সৃষ্টিকর্মে উদ্দেশ্য ছাড়া বিধেয়রও সবিশেষ প্রয়োজন, নইলে মহৎ উদ্দেশ্যেও যে attempt-এ পর্যবসিত হয় তা fair নয়, foul। উত্তর কলকাতার চূড়ান্ত হট্টগোলের মধ্যে ভারতের বৃহত্তম মেডিক্যাল কলেজের সামনে 'হাসপাতাল : গোলমাল করিবেন না' বিজ্ঞপ্তির মতই বাংলা দৈনিকের ক্রোড়পত্রে সাহিত্যের আস্বাদ দেবার হাস্যকর অপচেষ্টা। পরিবেশিত রচনা ও পরিবেশন রীতি দুয়েরই যে পরিবর্তন আশু প্রয়োজন, এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আশা করাও অন্যায়? সাহিত্য-বাসরে যে ধরণের লেখা সচরাচর প্রকাশিত তা অপ্রকাশিত থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়, এবং অপাংক্তেয় ও অক্ষম রচনা মুদ্রণের কি সার্থকতা তা সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। রবিবাসরীয়র যে matter, তা আদৌ কোন পদবাচ্য কি না এ চিন্তা সার্বজনীন ভাবে immaterial! অসুস্থ প্রচেষ্টায় দেদীপ্যমান এই চার পাতায় মেদই সব, মজ্জার চিহ্ন মাত্র নেই। তবে আশা এখনও পর্যাপ্ত যে পতন সুনিশ্চিত, এবং সে পুণ্যমুহূর্ত আসন্ন-প্রায় বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

চার পৃষ্ঠা ব্যাপী সাহিত্য-বাসরে গড়পড়তায় থাকে দুটো গল্প, একটা প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, ব্যক্তিগত রাশিফল, কখনও কোনও বিখ্যাত লোকের জীবনী, দু কলম ধরে এক ফিচার এবং মহাপুরুষদের বাণী। এই বাঁধা ছকে ফেলা নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হয় না। কিন্তু যে কোন হাতে লেখা পত্রিকায় এর চেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প প্রবন্ধের দেখা পাওয়া পাওয়া যায়। এবং সিংহ চর্মাবৃত সাহিত্য-সভা পড়লেই ভাব ও ভাষার, চিন্তা ও রচনারীতির বিপজ্জনক দৈন্য প্রতিভাত হয়। গল্পের বদলে এতে গাল-গপ্পোর ছড়াছড়ি, শিরোনামা সর্বস্ব সাহিত্য প্রবন্ধের (যার মুখবন্ধ পড়লেই বিদগ্ধ ব্যক্তির মুখ বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই) অবতারণা এবং

পুস্তক সমালোচনার নামে অশুদ্ধ পুস্তক পরিচিতি মাত্র। ইদানিং আবার লক্ষ্য করছি আদিবাসীদের সম্বন্ধে aboriginal লেখনীপ্রসূত রচনা!

রবিবাসরীয়র এই অভূতপূর্ব সম্পাদনার জন্য রাজচক্রবর্তী এবং গোঁসাই ঠাকুররা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। সম্পাদনার ইতিহাসে স্থূলত্বের উদাহরণ হিসেবে তাঁরা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ। বাংলা কাগজের সাহিত্য সভায় সব আছে, নেই শুধু নূতনত্ব সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও রচনা নির্বাচনের সামান্যতম দক্ষতা। সম্পাদনা করতে কি অলিখিত (তেল বা জল ছাড়া অন্য কিছু) বিশেষ গুণের প্রয়োজন তা আমাদের অজ'না। তবে এ কথা ঠিক যে journalism না বুঝলেও চলে অথবা নির্বাচন দক্ষতা বিবর্জিত হলে কিছু এসে যায় না। সাধ্য নেই এ কথা বোঝা যায়, কিন্তু সাধ? এবং অর্থশক্তি থাকলেও বুদ্ধি সামর্থে কুলোয় না বলেই এ কথা বলা যায় যে কোন বিত্তবান নিরক্ষরও এ কাজে সম্মান পারদর্শী।

আনন্দবাজার ও যুগান্তরে সাধারণত ছুটো করে গল্প থাকে। গল্প ছাপানর যৌক্তিকতা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু অপরিচিত এবং তরুণতর লেখকদের রচনা স্থান পায় না কোন যুক্তিতে? অথচ রবিবাসরীয়র মাধ্যমে অপরিচিত লেখকদের সামান্য সুযোগ করে দেবার অসামান্য সম্ভাবনা আছে। তার বদলে অধিকাংশ দিনে দেখা যায় পণ্ডিতমন্যদের নাম স্বাক্ষরিত তৃতীয় শ্রেণীর লেখার অসহ্য উপস্থিতি। এবং নূতন লেখকদের উল্লেখযোগ্য লেখার অভাব আছে—এ উত্তরও একদম অবিশ্বাস্য। এমন অভিযোগ আমরা বহুবার শুনেছি যে সাহিত্য সভার পারিষদ না হলে, অকৃত্রিম স্তুতি আর ব্যক্তিগত পরিচিতি ছাড়া ছাড়-পত্র লাভ অসম্ভব। বাংলা ক্রোড়পত্র জগতে পলিটিক্সের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অচল, যা চলে তা শুধুই dirty tricks—নোংরা দলাদলি ও কুৎসিত কুৎসার পীঠস্থান। 'টাকা দিতে হয় না'—এ দেশ বলেই দৈনিক পত্রিকায় লেখা পাঠানর নিয়মাবলীতে ছাপার হরফে বলা সম্ভব।

আনন্দবাজারের বিশেষত্ব তার বাঁধা লেখকগোষ্ঠীর রচনা প্রকাশে। নেহরু ছাড়া দেশ, মেনন ছাড়া বিদেশ যেমন কল্পনাতীত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাদে রবিবাসরীয় আনন্দবাজার অসম্পূর্ণ। 'শিলালিপি' লেখক

এই প্রাগৈতিহাসিক নারায়ণ আনন্দ-বাজারের শালগ্রাম শিলা, নিয়মিত ব্যবধানে এঁর লেখা দেখা যায়। চোদ্দই বৈশাখের গল্পের শেষদিকে লিখেছেন :

আজ সত্যিই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তিলে তিলে ক্ষয়ে গেছে তার ধার, নিভে গেছে তার উজ্জ্বলতা।

ভোঁতা হয়ে গিয়েছে! কোনদিন ধার ছিল বলে তো মনে পড়ে না, যা কেটেছেন তা তো ভারে মশাই!

পরের লাইন : আর তা কোন কাজেই লাগবে না।

লাগবে, নববর্ষে পাঁজীতে নিশ্চয় কাজে লাগবে।

ছাব্বিশে জ্যৈষ্ঠর আনন্দবাজারে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে, গল্পের ভাষার ধর্ম সম্বন্ধে তরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

গল্পের ভাষার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা।

এই দিনেই, কোন এক প্রবোধবন্ধু অধিকারী তাঁর গল্পে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করেছেন। নমুনা :

ভোর-রাত্রির শুকতারা আকাশের এক কোণে যখন বিদায়ী আলোর চমক ছড়ায়, সেই থেকে প্রভাতী সৌম্য-শান্ত পরিবেশে গুনগুনিয়ে ওঠে তানপুরার ছন্দায়িত সুর-ঝঙ্কার। নিঃসীম, নিস্তব্ধ প্রাক-প্রভাতী পৃথিবী। অনাবিল প্রশান্তির মায়াজালে আকাশ-পৃথিবী আচ্ছন্ন।...অনাবিল শান্তির ঝিমঝিম...

...করছে আমার মাথা।

অন্যত্র তাঁর নায়কের অমরাবতীর অনম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে ইনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন :

...না বা থাকল নৃত্যরতা উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভার চরণ-চাঞ্চল্য।

হ্যাঁ, ছবিতো আছে।

কিন্তু সত্য স্বীকারে কুণ্ঠিত নন ভদ্রলোক। এই জাতীয় লেখা সম্পর্কে রূপক করে এক জায়গায় লিখেছেন :

রীতিমত অমানুষিক কলরব।

আনন্দবাজার যদি হয় নারায়ণের লীলাধাম, যুগান্তর তা হলে বিষ্ণু-প্রিয়াদের সাহিত্য চর্চার সংরক্ষিত স্থান। দুটো গল্পের মধ্যে কদাচিত একটায় কোন পুরুষের নাম থাকে। বুঝতে পারি না ওটা পুরোপুরি মহিলা-মহল না ছেলেরাই বিরক্ত হয়ে মেয়েদের নাম নেন। নববর্ষের প্রথম দিনে, পয়লা বৈশাখ যুগান্তর সাময়িকীতে লিখেছেন 'অমৃতবাজার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। সন্দেহ নিরসনের জন্যে শিরোনামায় আছে 'ছোট গল্প'। প্রথম লাইন :

আমি খবরের কাগজের সম্পাদক।

কিন্তু আমরা তো সন্দেহ প্রকাশ করিনি! আবার অন্যত্র পড়ছি:

পেনশন এনেছো।

ধৃষ্টতা মার্জনীয়, কিন্তু সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এই যে পড়লাম আপনার বিনীত assertion?

আনন্দবাজারে 'কল্যাণবাণী' বিভাগে আছে মহাপুরুষদের কোরবানি করা। পনেরই বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের বাণী:

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত·····বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর করো।

বুমেরাং হয়ে গেল না?

যুগান্তরে 'ইতশ্চেতঃ' নামে ফিচারটির ভার নিয়েছেন বকলমে 'এককলমী'।

চব্বিশে চৈত্র ৬৩-র আরম্ভে:

রাক্ষসেরা কি ভাষায় কথা বলত তার একটি তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলাম..... আমি শুধু বিশেষ যুগের রাক্ষসদের সম্পর্কেই বলেছিলাম।

যুগের? যুগান্তরের নয়?

যুগান্তরে ক্রমশঃ প্রকাশিত একটি লেখার নাম 'হাকিমের ডায়েরী'। শেষ হলে বোধহয় আরম্ভ হবে 'গাঢ়লের ইতিবৃত্ত।'

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণরত যুগান্তরের দক্ষিণারঞ্জন বসু ওই কাগজে একটা লেখা ফেঁদেছেন। কালচারাল থেকে হর্টিকালচারাল প্রতিনিধিত্বের কল্যাণে বিদেশ প্রত্যাগত প্রায় প্রত্যেকেই একটা যা হোক কিছু লিখবেনই; সে যাই হক, 'বন্ বেড়িয়ে এলাম' কি 'বনগাঁ দেখে এলাম'! দক্ষিণারঞ্জনের লেখা থেকে উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ খুব কঠিন। চব্বিশে চৈত্র-৬৩র এক জায়গায়:

·····এ দোকান একটি বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্টোর।·····এক প্রৌঢ়া এর পরিচালিকা। তাঁর সহকারিণী নব-যৌবনা। সেদিকে একটু ভীড় বেশী। প্রৌঢ়ার কাছ থেকেই আমার কেনাকাটা।

আমাদের মত দক্ষিণারঞ্জনের স্ত্রী-ও যুগান্তর পড়েন বুঝি!

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী হয়ে সব চে যে সুবিধে হয়েছে তা হচ্ছে সব মক্কেলই আপন ends-উদ্ধারেও মওকা মাফিক রবীন্দ্র-উক্তি means হিসেবে ব্যবহার করেন। 'রবিবার' শীর্ষক 'রম্যরচনা'র ছাব্বিশে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এক সুরঞ্জন দত্তরায় আরম্ভ করেছেন রবীন্দ্র-শিখণ্ডী সামনে রেখে:

যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা।

ও ! পাছে আপনি আমি হপ্তার এই বিশেষ দিনটিকে একটু ভোগ করি, সেই আশঙ্কায় কি নিয়মিত প্রকাশ করা হয় বাজারের 'রবিবাসরীয় আলোচনী ?'

দশলাইন পরে :

এক অপূর্ব আনন্দলোকের বার্তা নিয়ে আসে বাঁধা ছুটির রবিবার।

ঠিক ! তবে যেখানে আনন্দবাজার পৌঁছয় না।

সমালোচনাকে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতিদানে আমরা এখনও কথঞ্চিত অনিচ্ছুক। এবং একমাত্র স্মরণীয় সমালোচনাই বরণীয় সাহিত্যের জন্মদাতা। 'পুস্তক সমালোচনা' নামে যে বস্তুটি সব কাগজে পাবেন তা আসলে আলোচ্য পুস্তকের write up বা পরিচিতি মাত্র এবং বহুক্ষেত্রে নাকি স্বয়ং লেখকই এর গুরুভার লাঘব করেন নিজে লিখে ! সৎ-সমালোচনা না থাকলে অসৎ সাহিত্য হতে বাধ্য, তাই সমালোচনার সুস্থ সম্মার্জনী ব্যবহারের অভাবে যোগ্যতর বই থাকে অনুল্লেখযোগ্য অবস্থায়, আর নিজগোষ্ঠীভুক্ত লেখকের সাধারণ রচনা পায় অসাধারণ সৃষ্টির শিলমোহর। রবিবারে প্রকাশিত সমালোচনা তথা পরিচিতি তথা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপনের বক্তব্য মূলতঃ এক। কুড়ি লাইনের মধ্যে তিন ভাগ থাকে লেখকের (দেশের লোক হলে) নির্লজ্জ স্তাবকতা আর বাকীটায়—

মনোহর প্রচ্ছদ শোভিত...মুদ্রণ পারিপাট্য ...বাঁধাই উত্তম।

বাঁধাই উত্তম ? না বেঁধে উত্তম-মধ্যম ? কোনটা ?

রবিবার পর্যায়ে সব শেষে যে কথা বলছি তা পাঠকবধের অস্ত্র হিসেবে মোক্ষম, এমন অব্যর্থ তার লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ না করেও হয়ত আনন্দ-বাজার পূজা সংখ্যা সম্ভব, কিন্তু 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' ছাড়া কোন বাংলা কাগজ অসম্ভব। সমস্ত সংবাদ-পত্রের একটি করে দৈবাচার্য বা শর্মাচার্য আছেন যাঁরা প্রতি রবিবার জন্মরাশি ও লগ্ন হিসেবে ব্যক্তিগত ফলাফল ঘোষণা করেন। Mass scale-এ জ্যোতিষা হয় না, কিন্তু mass slaughter তো হয় ! কংগ্রেসী কবলে ও কালোবাজারের স্পর্শদুষ্ট হয়ে আমরা আজ ফ্রাসট্রেশানের যূপকাষ্ঠে ; এবং আইন বাঁচিয়ে, ভবিষ্যতে কি করব না ভেবে কি হবে, তার চিন্তায় আকুল মধ্যবিত্ত

বাঙালীকে exploit করার প্রচেষ্টায় তাঁরা অত্যন্ত সফল ! এমন বহু লোক দেখা যায় যিনি কাগজ পড়তে নিয়ে হয়ত সর্বসমক্ষে বলে সম্পাদকীয়তে চোখ বোলাবেন এবং আপনি পিছন ফিরলেই শর্মাচার্যের দৈববাণীতে মন বসাবেন। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষের দুর্বলতার এই অন্যায় সুযোগ গ্রহণ প্রয়োজন হলে আইন করে বন্ধ করা কর্তব্য।

পুনশ্চ !

ছাব্বিশে জ্যৈষ্ঠর আনন্দবাজারে রবিবাসরীয় আলোচনী !!

প্রকাশিত যে 'রবিবার'-এর কথা আগে বলেছি, তার শেষ লাইন কটা না দিলে এ লেখা অসম্পূর্ণ থাকবে। রবিবার ক্ষণস্থায়ী বলে দুঃখপ্রকাশের পর ভদ্রলোক এই আশা প্রকাশ করে শেষ করেছেন যে :

কিন্তু রবিবারের রাত ভোর হলে সোম যদি আসেই, সামনের রবি-ই বা তবে কতদূরে আর।

বাংলা মানে হচ্ছে : আবার আসবে

চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য।

অচিন্ত্যকুমার প্রণীত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম খণ্ড প্রকাশের প্রাক্কালে প্রকাশক, যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বলেন : এ বইটি সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলাই বাহুল্য ; এ বইকে ভালো আপনাকে বলতে হবেই। স্বাধীনচেতা নির্ভীক বিবেকানন্দ ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলেন : কেন ? ভালো বলতেই হবে কেন ? প্রকাশক দিলীপ গুপ্ত এতটুকু বিচলিত না হয়ে জবাব দেন : বলতে হবে এই জন্যে যে বইটি যাঁর সম্বন্ধে তাঁর সম্বন্ধে ভালো ছাড়া অন্য কিছু বলা বিবেকানন্দর পক্ষে অসম্ভব যে!

CENTRAL LIBRARY

এখন সকাল।

অনেক কমলা রঙের রোদ আকাশ ভরে। পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছটার প্রত্যন্ত শাখায় আলোর প্রলেপ। রাঙা ফুলে চোখ জ্বালা করা দাহ। দেখা যায় নেটের মশারীর ফাঁক দিয়ে।

অনেক হাওয়া। মশারীর নেট ফুলে ফুলে ওঠে। গায়ে এসে লাগে অল্প অল্প। গা ভরে গেছে ঘামে। অজস্র মুক্তাবিন্দু বুকের উপত্যকায়। সিলিং ফ্যান বন্ধ। ওপাশের জানলার ধারে ইজিচেয়ার পাতা। খস্ খস্ কাগজের শব্দ। সুপ্রকাশের সকালের অবকাশ। চায়ের সঙ্গে আর এক দুর্বোধ্য নেশায় আচ্ছন্ন। কালো কালো হরফের কারিগরী। জট-পাকানো দুনিয়ার খবর। বিরক্তিকর!

হাই তুলল অমলা। আড়মোড়া ভাঙল কোলবালিশ বুকে চেপে। চট্‌চট্ করছে গা। বিস্রস্ত বেশ। অনাবৃত পায়ের মাংসল ডিম পাথরে কোঁদা, মসৃণ। হাতের নখে অল্প ময়লা। কাল কি চুলকেছিল পা-হাত? ক'টা বাজল?

ঝিম ঝিম করে মাথাটা। কোল-বালিশে মাথা চেপে কুকুর-কুণ্ডলি হতে চায়। ভোরে ঘুম ভেঙেছিল। তখন নিজেকে পেয়েছিল সুপ্রকাশের ক্লান্ত আশ্লেষে। নরম শরীর ছেড়ে দিয়েছিল পুরুষ বাহুবেষ্টনে। আরামে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চোখের পাতা। কুয়াশার মত আবছা হয়ে গিয়েছিল চেতনা। ভাল লেগেছিল সব। দায় নেই আজ সকাল বেলায়। রবিবারের পূর্ণ অবকাশের প্রস্তুতি। আরামে নেমে এসেছিল ঘুম দু' চোখে।

খস্ খস্ খবরের কাগজের শব্দ; মাটিতে নামিয়ে তাকাল সুপ্রকাশ। "ঘুম ভেঙেছে? উঠবে নাকি? আটটা বাজে!"

"উঁ উ", অনুনাসিক গদগদ ধ্বনি অমলার গলায়। আঁকড়ে আছে বালিশ।

"ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও? আমি এবার বাজারে যাব।"

"উঁ উঁ", অনুযোগ ধ্বনিত হল। কেন তুমি উঠে গেছ আমাকে রেখে। কিম্বা আমি এখন তোমার কোলে নেই কেন? অথবা এত তাড়াতাড়ি আটটা বাজে কেন? আজ তো রবিবার। তবে এত তাড়া কিসের? হয় তো এও হতে পারে, তুমি আমাকে কোলে তুলে নামিয়ে নাও।

সিগারেটের টিন খোলার শব্দ। আপনা থেকে নাকে আসে তামাক আর টিনের মিশ্রিত গন্ধ। ভাল লাগে, ওই গন্ধটুকুর লোভে নিজে থেকে টিন খুলে সিগারেট বার করে দিতে সাধ যায়। দেশলাই জ্বালানোর আওয়াজ। একটু পরেই হাওয়ায় ভেসে আসা পাতলা ধোঁওয়ার গন্ধ। ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে।

সুপ্রকাশ যদি সিগারেট না খেতো? ভাল হত না তাহলে। সুপ্রকাশ তাহলে পুরুষ হত না। ওর কঠিন বাহুবেষ্টন হত নিরর্থক। ওর পাতলা গোঁফের রেখা মনে হত আঠা দিয়ে লাগানো। ওর দু'গাল দু'হাতে চেপে ধরে কখনো নোয়াতে ভাল লাগত না মাথা ওর ঠোঁটে। ওর গাম্ভীর্য হত মুখোস। আদর আদিখ্যেতা।

কিচ্‌মিচ্‌ করে ঘরে ঢুকল একটা চড়াই পাখী। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে, কিচিরমিচির, কিচিরমিচির। কংক্রীটের দেওয়ালে আর সিলিঙে আঁচড় কাটার ব্যর্থ চেষ্টা। তারপর ভেন্টিলেটারের চৌখুপীতে পরিচিত আশ্রয়। খড়-কুটো এনেছে কতক-গুলো। বাসা বাঁধবে নাকি? কিন্তু একা কেন? ওর বর কই? বর না বউ?

উঠে বসতে হয় বিছানায়। আটটা বুঝি বেজে গেছে? বোশেখের আকাশে দুপুরের রোদ্দুর। এখুনি ঘরে আসবে চরণের মা। অনেক দিনের কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড। তাই মুখরা। বাসন মাজা থেকে কাপড় কাচা, বাটনা বাটা আর জল তোলা, উনোন ধরানো আর ঘর দুয়োর ঝাড়া-মোছা, সব ওই পনের টাকায়। টিক টিক করে দিন রাত। বৌদিদিকে ততটা পছন্দ নয়, যতটা দাদাবাবুকে। "পুরুষ মানুষ নিজে চা কফি তৈরী করে নেবে, এ কেমন কথা? যেমন তেমন করে রান্না করা। এ কেমন মেয়েমানুষের

রীতি ?" গা জ্বলে যায় ওর কথায়। তবু কিছু বলা যায় না। ভারি পরিষ্কার কাজ। দেখতে হয় না কিছু।

আঁচল খসে গেছে। চারিধারে মশারীর আব্রু। দোতালার ঘর। পাশেই চওড়া গলি। তারপর পার্ক। কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপাশে রেলিং দেওয়া সীমানা। তারপর বড় রাস্তা। ট্রাম যায়, বাস যায়, আর যায় গাড়ি ঘোড়া।

আড়চোখে দেখে নেয় দরজাটা। এখন বন্ধ। কড়া নেড়ে তবে খুলবে চরণের মা। অনেক বার লজ্জা পেয়ে এই বুদ্ধি। আলমারীর কাছে পিছন ফিরে সুপ্রকাশ। আঁচল দিয়ে বুক আর পিঠ মুছে নেয় অমলা। কুটকুট করে গা। ঘামাচি হল নাকি?

বালিশের নীচে অন্তর্বাস। দলা পাকানো। ষ্ট্র্যাপ দুটো পাকিয়ে গেছে। খুলে হাতে গলিয়ে লাগিয়ে নিল বুকে। আঁচল টেনে দিল গায়ে। হাঁটুর নীচে নামিয়ে দিল সায়া আর শাড়ী। বাইরে এল মশারী তুলে।

পিছন ফিরে তাকাল সুপ্রকাশ। দুষ্ট হাসি মুখে। "কত বেলা হল দেখেছ? যাও না, চরণের মার কাছে বকুনি খাবে।"

ফুলে উঠল ঠোঁট, ভারি হয়ে উঠল চোখের পাতা। চুপচাপ রইল দাঁড়িয়ে।

এগিয়ে এল সুপ্রকাশ। কাঁধে রাখল হাত। "আবার রাগ হল বুঝি?"

ঝাঁপিয়ে পড়ল অমলা। মাথা ঘষতে লাগল সুপ্রকাশের বুকে। দু' হাতে জড়িয়ে ধরল গলা। "কেন তুমি আমার আগে উঠলে?"

সুপ্রকাশের মনে অস্বস্তি। বেলা হয়ে গেছে। বাজারে পাওয়া যাবে না গলদা চিংড়ি। "তুমি না আজ বেরুবে দুপুরে? তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়া সেরে নেবে বলেছিলে যে কাল? ভুলে গেছ সব?"

ভুলেছিই তো। ভাবল অমলা। আর ভাবল, কেন মনে করিয়ে দাও এই সকাল বেলাতেই, সব কাজের কথা? কাজের জন্যে তো আছে সারাটা দিন। আছে পড়াশুনো, বক্তৃতা, বাজে তর্ক। আছে শত অকাজ। সে আর এক জীবন। অন্য এক চেতনা। পরিশীলিত, পরিমার্জিত, ছকে বাঁধা জীবনায়ণ। ক্লাস-লাইব্রেরী-পার্টি-অফিস। মাপা কথা, ঋজু গতি, অগভীর প্রাণের পল্বল। ঝোড়ো হাওয়ায় আঁচল ফুলিয়ে ওড়ার সাধ থাকে মনে। খর স্রোতে ঝাঁপিয়ে উথাল পাথাল হতে বাধা। সব কিছু

॥ বিলম্বিত ॥

মেপে মেপে। সে শুধু শুকনো কথার জগৎ। অর্থহীন কবিতার স্থান কোথায়? এই এখন, দখিনের দূরান্ত সমুদ্র থেকে বাতাস ভেসে এসে গায়ের সঙ্গে লেপে ধরেছে শাড়ি। শরীরে ক্লান্ত মদির অস্থিরতা। সপ্তাহব্যাপী কাজের মরুর পরিসর সম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়েছে এক মুহূর্তের ছুটির ওয়েসিসকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। কৃষ্ণচূড়ার রক্ত উচ্ছ্বাসের মত মন এখন রাঙিয়ে উঠেছে অকারণে। সময়ের কাছে চায়ের পিয়ালার মিষ্টি আমেজের প্রত্যাশা। এখন কাজের কথা কেন? হঠাৎ কি ছুঁতে নেই একটুখানি? একটু অন্য কথা? দুলিয়ে দেওয়া, ভাল লাগিয়ে দেওয়া, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে দেওয়া, এমন কোন ভঙ্গী?

ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল অমলা। বিস্রস্ত বেশ। কপালের চুল এলোমেলো। চোখ ঢেকেছে দু'হাতে। অনাবৃত বাহুমূল। অন্তর্বাসে পিষ্ট পৃথুল যৌবন। মেদের আস্তরণ নাভিদেশে।

অভ্যস্ত চোখ। তবু বুক কেমন করে ওঠে। দৃষ্টি ফেরাতে পারে না সুপ্রকাশ। কাছে আসতে লোভ হয়। দ্রুত স্পন্দন নাড়িতে। অবেলায় একি অনিয়মের ইচ্ছে? পিছনে চরণের মায়ের কাল্পনিক উপস্থিতি। মনে উধাও সময়ের পদধ্বনি। গলদা চিংড়ি আর কাঁচা আম। বাজারের ভিড়। আলুওয়ালার টাকার ভাংানি। খারাপ দু'আনি চালায় সময় বুঝে। দই আনতে হবে একটু বেলায়। মিষ্টির দোকানের পাশে ডাক্তারখানা। ওষুধ আর ভিটামিন। ফ্যামিলি প্ল্যানিং। পরিমিত প্রেম। স্বাধীনতার মধ্যেও আশ্চর্য পরাধীন। তাই কি অসময়ে অবদমিত আবেগ এমন উদগ্র হয়ে ওঠে?

ইলিবিলি কেটে দিল অমলার মাথায় চুলে। "অমলা! অমলি! ইমলি!"

হাত সরিয়ে তাকাল অমলা। অবুঝ আবদার মাখা চোখ।

হাসল সুপ্রকাশ। "উঠ শিগু, মুখ ধোও।" হাত ধরে তুলল তাকে। আলতো করে জড়িয়ে ধরল বুকে। চিবুকে হাত দিল। "পর নিজ বেশ।"

লজ্জায় এলিয়ে দিল ঘাড়। হাসির আভাস দেখা গেল ঠোঁটের প্রান্তে।

এই তো আমার বেশ। মনে মনে বলল অমলা। তুমিই তো ঢেকে রাখবে আমাকে। আড়াল করে রাখবে। মিশিয়ে নেবে তোমার

মধ্যে। আমার অস্তিত্ব, আমার লজ্জা, তুমি ছাড়া কিসের আবরণে ঢাকি ?

"এবারে ছাড়। বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাজারে যেতে হবে।"

ছিটকে সরে গেল অমলা। "যাও, যাও, এখনি যাও। কেন আছ এখনো দাঁড়িয়ে ?"

কাছে গিয়ে আবার তাকে টেনে নিলো সুপ্রকাশ। অবসন্ন আশ্লেষ। দায় সারা সোহাগ। ভাল লাগে কমনীয় স্পর্শ। কিন্তু ভাল লাগানো কী শক্ত! কোথায় সে অবকাশ? কত বাধা চারিদিকে। নিয়ম আর শৃঙ্খলার যতি। নিয়ন্ত্রিত জীবন। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা ছুঁই ছুঁই। বাজার যেতে পৌনে ন'টা। ফিরে আসতে সাড়ে নয়। চরণের মা কি করছে? "শুধু শুধু রাগ করো কেন?"

দু' হাতে আঁকড়ে রইল গলা। ছেড়ে দেবে না কিছুতে। আদুরে কণ্ঠস্বর অমলার। "তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না। একটুও না। এক কোঁটাও না।"

"না." হাসল সুপ্রকাশ। "শুধু ঝগড়া করি কেমন?"

"করোই তো!" হাত সরিয়ে নিল অমলা। চলে গেল ড্রেসিঙের কাছে। "তোমার তো শুধু কাজের কথা। শুধু ব্যস্ততা। রবিবারেও বিশ্রাম নেই।"

"ঠিক বলেছ।" আবার হাসল সুপ্রকাশ। সারাদিন আজ তার ছুটি। কিন্তু অমলার আছে হাজার অকাজের দায়। চারটেয় মিটিং। দুপুর থেকেই তার প্রস্তুতি। শনিবার শুনিয়ে রেখেছে। সুপ্রকাশের দুপুর কাটবে একা বাড়িতে। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ অচল। অমলা মানবে না এখন।

নিপুণ হাতে পেষ্ট লাগালো টুথ-ব্রাশে। লোকাথোরের মত লালাসিক্ত ফুলো গাল। হাওয়ায় উড়ছে আঁচল। অমলাকে দেখে কে বলবে পড়ায় সে কলেজে? কে জানবে এই মুহূর্তে বয়সের উজান ঠেলে পিছিয়ে এনেছে অনেক সৌর-পরিক্রমা? ও যেন কুমারী এখন। ভারী ছেলেমানুষ।

হাফ সার্ট গলিয়ে নিল গায়ে। অগোছালো চুলে চিরুনি বোলালো একটু। পকেটে নিল ম্যানিব্যাগ। বারান্দায় পেরেকে ঝোলানো থলি আছে। বাজারে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সুপ্রকাশ। আজ এত তাড়াতাড়ি নাই বা হত সকাল? অভ্যাসমত চোখ পড়ল হাতঘড়িতে। চটি পায়ে ফট্ ফট্ করে নেমে গেল সে সিঁড়ি বেয়ে।

চুপচাপ জানালার দিকে চেয়ে রইল অমলা। পার্কে খেলা করছে ছেলেরা। এই রোদ্দুরে কি করে পারে? মেয়েরা দুলছে দোলনায়। হাওয়ায় উড়ছে ফ্রক! ধুলো মাখছে শিশু। নিষ্পাপ দ্যুতিময় চোখগুলি। রাস্তার কলে ভীড় জমেছে। বালতির আওয়াজ। ঝগড়ার আভাস। দুটো তিনটে কাক তারস্বরে ডাকছে একদিকে তাকিয়ে। কাদের বাসায় মাছ ভাজা হচ্ছে। গন্ধ নাকে এসে লাগে। একটু একটু করে সাড়া জাগতে থাকে শরীরে।

কাজ আছে এখন। অনেক কাজ। মশারী তুলতে হবে, বিছানা ঝাড়তে। বই খাতা গুছিয়ে রাখতে হবে টেবিলে। মিটিঙ আছে বিকেলে। বলতে হবে। কিছুটা তৈরী হয়েছে ইতিমধ্যে। বাকি আছে অল্পটুকু। নীলেশ আসবে বলেছে দুপুরে। মাথায় ঢেউ তোলা কটা চুল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বাইশ বছরের ছেলের মুখে বত্রিশ বছরের গাম্ভীর্য। ইউনিভার্সিটির ছাত্র। পলিটিক্যাল সায়েন্স হল সাবজেক্ট। রসিকতা বোঝে কিন্তু হাসে না। যেন হাসাটা এনার্জির বাজে খরচ। বক্তৃতা দেয় ভাল। জানে না গল্প করতে। আজে বাজে কথা উঠলে গম্ভীর হয়ে চেয়ে থাকে অন্য দিকে। নয় তো চুরুট ধরায়। কটু-গন্ধ সস্তা চুরুট। নিঃসঙ্কোচ যতখানি, তার চেয়ে বেশী সচেতন। আজকের মিটিঙের জয়েন্ট কনভেনর, অমলা আর নীলেশ।

এক টুকরো ছাই গড়িয়ে গেল মেঝেয়। সুপ্রকাশ সিগারেট খেয়েছিল একটু আগে। এ্যাশট্রেতে ফেলতে গিয়ে মাটিতে পড়েছিল হয়ত। আজ রবিবার। জামা কাপড় ঠিক করতে হবে। কাল থেকে সপ্তাহ শুরু। ওর অফিস, অমলার কলেজ। ডাইং ক্লিনিংএ পাঠাতে হবে ময়লা পোষাক। এখনি বাজার নিয়ে আসবে। গলদা চিংড়ি খাবার সখ হয়েছে। মালাই কারী আর মাথা ভাজা। মায়ের কাছে ও দুটো শিখেছিল অমলা। খুব কাজে লেগেছে। বাকী রান্না তো চালিয়ে নেওয়া কোন রকমে।

"বৌদিদি!" ফাটা কাঁসার বাসনের মত আওয়াজ হল বারান্দায়। দরজাটা খোলা আছে। না হলে খট্‌খট্ খট্‌খট্ নাড়তো কড়া। পিছন ফিরে তাকাবে না অমলা। এখুনি কতগুলো কড়া কথা শোনাবে চরণের মা। ওর সঙ্গে ঝগড়া করে পারবে না সে। পাশের ফ্ল্যাটের বৌয়ের সঙ্গে ভারি

ভাব চরণের মায়ের। দুপুরে গল্প করে গিয়ে। সুপুরি কেটে দেয়। কাঁথা সেলাই করে। বারণ করতে গিয়ে বেকুব হয়েছিল অমলা। "জাঁতি ধরার সুখ তুমি কি বুঝবে বৌদিদি? পান তো খেলে নি?" কাঁথা তৈরীর প্রসঙ্গ উঠবে আশঙ্কা করে তাড়াতাড়ি চারটে পয়সা বার করে দিয়েছিল অমলা। "পান খাওগে তুমি।"

ঘরের ভেতরে এক পা বাড়িয়ে শুরু করল চরণের মা। "অ মা! এখনো মুখটাও ধোওনি? দু-দুবার চায়ের জল ফুটিয়ে নামিয়ে রাখনু। দাদাবাবু বললে ঘুমুচ্ছ। কি জানি বাপু। আমাদেব তো কাক ডাকলে দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনা। দাদাবাবু এখুনি বাজার নিয়ে এসবে। রান্না ঘরে কি যাবে নি আজ?"

অনেক দিন রান্নাও করতে হয়েছে চরণের মাকে। মোটামুটি ভাত-ডাল তরকারি। আপত্তি করে না সে। কিন্তু সে রান্না কি ভদ্দরলোকের পাতে দেবার মত? সোয়ামীকে ভাল মন্দ দুটো রান্না করে খাওয়াতে সাধ যায় যায় না. মেয়ে মানুষের এ কেমন রীতি গ? আবার ভালবাসার ঢঙ আছে। যতটুকু সময় একত্তর থাকবে, গায়ে গায়ে লেগে আছে। ঘোর কলি, ঘোর কলি। এমন অনাচার যে বাড়িতে. সেখানে কাজ করতে কি ইচ্ছে হয়? নেহাৎ ভাল মানুষ মনিব! মাইনে ছাড়াও এটা সেটা এখন তখন দেয়, তাই পড়ে আছে। এই তো এতগুলি পরিবার আছে আর সব ফেলাটে। কারো ঘরে তো এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখিনে। নেখাপড়া শেখার মাথায় ঝাড়ু। আবার কলেজে পড়ায়! এমনি বিবিয়ানাই শেখায়। এই জন্যেই তো শাস্তরে নিকেছে, মেয়ে মানুষের বেশী নেখাপড়া শেখা ভাল নয়।

"কি গো বৌদিদি, আমার তো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবেনি: ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে।"

ফেনা ভর্তি মুখে কোন রকমে কথা বলল অমলা। "উনোন ধরেছে?"

"সে তো সেই কখন থেকে, হু হু করে জ্বলছে রাবণের চিতে।"

কিছুটা ইসারায়, বাকিটা কথায় বুঝিয়ে দিল অমলা। সে এখন বাথ-রুমে যাচ্ছে। স্নান সেরে যাবে রান্না ঘরে। ভাত চড়িয়ে দিক চরণের মা। আদা-পেঁয়াজ বেটে রাখুক কিছুটা।

'রাঁধার পরে খাওয়া নয় খাওয়ার পরে. রাঁধা।' ঠিক এমনি এক চাকাতেই বাঁধা নয়। অনেক ছড়ানো

ছিটোনো এ জীবন। কথা-হাসি-গান, পুড়ানো বেড়ানো সিনেমা দেখা। সুপ্রকাশের সঙ্গে খুনসুড়ি। নীলেশের সঙ্গে তর্ক। পরীক্ষার খাতা দেখা। ব্লাউসের হাতার নক্সা তোলা। একৃজিবিশনে ছবির সমালোচনা, প্রফেসরস্ রুমে সাহিত্যের। তৃতীয় প্রাণীর জন্যে মাঝে মাঝে আকুল হয় মন। প্রশ্রয় পায় না। সে সাধ চাপা দিতে হয় অন্য চিন্তায়। আর সব ফ্ল্যাটের বউদের মত ফুরিয়ে যাবে নাকি দুদিনে?

সাড়ি সায়া নিয়ে চলে গেল বাথ-রুমে। তেলের মিষ্টি গন্ধ। সাবানের সৌরভ। চৌবাচ্চার বাঁধা জলে গভীর দীঘির হাতছানি। দু-জনার সংসার। অপ্রতুলতা নেই কোথায়ও। খুসীমত খরচ করা যায় টাকা কিম্বা জল। যায় বলেই বুঝি প্রয়োজন মিটিয়েই সমাপ্তি।

চেয়ে দেখে নিজের দিকে। চৌবাচ্চায় নিটোল রূপ প্রতিবিম্বিত। 'নারীর ললিত লোভন লীলা।' মগের ধারাজলে মন ভেজেনা। ডুব দেবার সাধ সর্বাঙ্গে। সাধ্য কই?

স্নান সেরে যেতে হবে রান্না ঘরে। অন্যদিন কাজের তাড়ায় খাওয়াটা হয় গেলা। স্বাদের কথা ভুলতে হয়। পেট যদি বা ভরে, জিভ থাকে উপবাসী। গলদা চিংড়ির মালাইকারী আর আমের ঝোল। শেষ পাতে দই। আজ দুটি বেশী ভাত খাবে সুপ্রকাশ। খাওয়ার শেষে মিঠে পান মুখে দিয়ে ধরাবে সিগারেট। পরিতৃপ্তির সশব্দ উদ্গার। রান্না ভাল হলে মুখে বলবে না কিছু। চোখ দেখে বোঝা যাবে। কখনো বেশী চায়না। স্ত্রীর স্বাধীনতায় হাত দিতে সদা সঙ্কোচ। ওকে খুসী করা কত সহজ। শত্রুও কি কম? মায়ের মত মালাই-কারী রান্নার মন পাবে কোথায় অমলা? অনভ্যাসের কোঁটা।

নীলেশের স্তুতি বড় প্রকট। অমলা যেন শুধু নারী নয়। লজ্জা নাকি মানায় না ওকে? আত্মসমর্পন আত্ম-প্রতারণারই নামান্তর। আদর আর ভালবাসার কথা শুধু মেয়েরা বলবে। সে যে ঘুম ভাঙানিয়া, দুখ জাগানিয়া। শুনতে শুনতে নেশা ধরে যায়। আফিমের চেয়ে তীব্র। মদের থেকে উগ্র। ঝিম ঝিম করে মাথা।'

"আমি ভেবে পাইনা অমলাদি, আপনি বিয়ে করলেন কি করে?" তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ নীলেশের দু চোখে বিচ্ছুরিত। "কী পেয়েছেন বিবাহিত জীবনে? দৈহিক সুখ? সে তো

পশুর কাম্য। নিশ্চিন্ত জীবন? সে তো মৃত্যুর তুল্য। সংস্কার কাটাতে পারেননি? আপনিই যদি না পারেন তবে পারবে কে? পথ দেখাবে কে?

বোকা ছেলে! নিজের মন দিয়ে দেখে দুনিয়াটা। প্রথম যৌবনের বেপরোয়া বেহিসেবী ভাবনা কস্তুরী হরিণের মত আত্মপ্রেমেই মশগুল। 'আপন মনের মাধুরি মিশায়ে' তৈরী করেছে অমলাদিকে। অন্যরকম দেখলে তাই ক্ষেপে যায়।

স্নান সেরে ঘরে এল অমলা। চোখের পাতায় জলবিন্দু। ভিজে চুলের রাশ পিঠে ছড়ানো। খিল তুলে দিল দরজায়। ফ্যান খুলে ফেলে দিল আঁচল। জুড়িয়ে যাক সব দাহ। ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে রইল ড্রেসিঙের আয়নায়। ঘামাচি হয়েছে বুকে। কোমরে কাপড়ের কষির দাগ। গলায় ভাঁজ পড়েছে গোটা দুই। পাউডার গায় বুলিয়ে দিতে আরাম লাগে। মানুষ মানে কি শুধু মানসিকতা? শরীরের স্বাদ কিছু না? ভালবাসা যদি মোহ হয়, রাজনীতি তবে মদ। ছেলেমানুষ নীলেশ। শুকনো মতবাদের ধোঁয়ায় ঝাপসা ওর দৃষ্টি। এই মুহূর্তে খুব করে হেসে উঠতে পারে নীলেশের মুখের ওপরে। তার মুখ থেকে কড়া চুরুট ছুঁড়ে ফেলে চকোলেট দিতে পারে তুলে। বলতে পারে অনায়াসে: 'পিঁড়ি পেতে বস দেখি রান্না ঘরের সামনে। গরম গরম পাঁপড় ভেজে দি। চা খাবে এক কাপ?'

কি পাগলের মত ভাবছে সে? বিকেল চারটেয় মিটিঙ। চার পাঁচটা রেজোলুশন্ পাশ করাতে হবে। নীলেশের চোখে প্রখর দীপ্তি। তৈরী না হয়ে গেলে রক্ষে রাখবে না।

কিন্তু কোন্ ভুলের নেশায় পেয়েছে আজ তাকে? আলনা থেকে অবহেলিত শাড়িটাই কি নিতে হয়? এলোচুলে একটা গিঁট দিয়েছে কখন। সিঁথেয় চওড়া সিঁদুর। মাথায় তুলে দিয়েছে লাল পাড় ঘোমটা। গুনগুন করে উঠল আপনা থেকে। 'মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরি।'

রান্না ঘরে বাজারের থলি রেখে এসেছে সুপ্রকাশ। ঘামে ভেজা সর্বাঙ্গ। জানলার ধারে ইজি চেয়ার টেনে বসার লোভ এখন। অর্ধপঠিত খবরের কাগজের আকর্ষণ। দরজায় টোকা দিল অসহিষ্ণু হাতে।

আশ্চর্য হয়ে গেল সুপ্রকাশ। ভয়ানক অবাক। এ কোন্ অমলা? কোথায় মিলিয়ে গেছে ঝড়ের

আঘাত। বিলুপ্ত মনের দাহ। আকাশের নীল আলো নিথর হয়ে নেমেছে মুখে। দু'চোখ মমতা মাখা। পরণে মিলের সাড়ি, কপালে সিঁদুর। এই কি কলেজে যাওয়ার সাজ! নাকি মিটিঙের? কৌতুক হাসিতে ভরে গেল চোখ কাণায় কাণায়।

তাকিয়ে দেখল অমলা। তারপর নামিয়ে নিল দৃষ্টি। কৃষ্ণচূড়ার রাঙা আভা গালে। ওকে খুসী করা কত সহজ। ভাবল অমলা। শক্তও কি কম?

নীলেশ আসবে বুঝি দুপুর বেলা? এলে বললেই হবে ভারি মাথা ধরেছে!

রহস্যজনকভাবে বাঁচা!

জীবন্ত ডিটেকটিভ-চরিত্র কিরীটি রায়ের স্রষ্টা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকও বটে! তাঁর তত্ত্বাবধানে এক সময় একটি মেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। ডাঃ নীহাররঞ্জন লক্ষ্য করলেন যে মেয়েটি তাঁর একটি ধারাবাহিক রহস্য গল্প পড়ছে একটি মাসিকে। রহস্যগল্পটির নায়িকার আবার মেয়েটির যে অসুখ, সেই অসুখই হয়েছে। নায়িকা সেই অসুখে মারা যাবে,—এইরকম একটা প্ল্যান ছিল নীহাররঞ্জনের প্রথমে। মেয়েটির কথা ভেবে নায়িকাকে সারিয়ে তুললেন তিনি। এবং সেই মেয়েটিও ধীরে ধীরে সেরে উঠল গল্পটি পড়তে পড়তে!

॥ চিঠিপত্তরের জঞ্জাল ॥

॥ মহাদেব বসু, হাওড়া ॥

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপরে তুলনামূলক মন্তব্য করুন না ?

প্রথম প্ল্যানকে প্রথমে মনে হয়েছিল ঘোড়ার ডিম ; কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ওধারনা ভুল। প্রথম প্ল্যানের ডিম ফুটে দ্বিতীয় প্ল্যানের যে বাচ্চা বেরিয়েছে তার রকম সকম দেখে আর সন্দেহ থাকছে না যে প্ল্যানের ডিম আসলে খাঁটি ঘোড়ার ডিম নয়, নিশ্চিতই রয়েছে তাতে গাধারও ভেজাল !

মূল রাশিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকিতা ক্রুশ্চেভ আর তার শাখা ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অজয় ঘোষ, দু'য়েতে তফাৎ কী ?

মূলে এবং শাখায় যা তফাৎ থাকে তাই। মৃগ এবং শাখামৃগের তফাৎ।

॥ মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক, বজবজ ॥

পর্তুগীজ সরকার কি কোন সর্তেই গোয়ার ভারতভুক্তিতে সম্মত হবে না ?

একটি মাত্র সর্তে হতে পারে—ভারতের পর্তুগাল ভুক্তি !

ভারত সরকারের গোয়া নীতি আপনি সমর্থন করেন ?

কাশ্মীর নীতির চেয়ে করি ; গোয়া নিয়ে অন্ততঃ আমরা ইউ, এন, ও' তে নালিশ করার বোকামি করে বসি নি।

॥ দুর্লভ চন্দ্র চন্দ্র, বেলেঘাটা ॥

১৭৫৭ সালে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সুরু, ১৮৫৭য় সিপাহী বিদ্রোহ, আর ১৯৫৭ সালে কেরালায় কমিউনিষ্ট সরকার স্থাপিত। ২০৫৭ সালে কী হবে ভবিষ্যদ্বাণী করুন তো দেখি ?

সম্ভবতঃ নয়াদিল্লীতে কমিউনিষ্ট সরকার স্থাপিত হবে : কমিউনিষ্ট-কচ্ছপের কংগ্রেস-খরগোসকে. হারাতে দৌড়ের পাল্লা চাই শতাব্দীব্যাপা ! কিংবা ২০৫৭ সালে হয়ত কেরালার সরকারেরই পতন হবে : কনষ্টিটুশনাল কমিউনিজম ত্রিবান্দ্রামে যে-পরিমান অতি-সাবধান হয়ে রয়েছে তাতে একশ বছরের আগে কিছু নড়ন-চড়ন হবে বলে তো মনে হয় না !

॥ দেবীদাস মাহাতো, পুরুলিয়া ॥

বিহারে মহামায়াপ্রসাদ সিংহ আর উত্তর প্রদেশে চন্দ্রভান গুপ্ত হেরে যাবার ফলে কংগ্রেস-মহল নাকি আসলে খুশীই হয়েছে ? সত্যি ?

কোন্ কংগ্রেস মহল ? চন্দ্রভান হারাতে পন্থের কংগ্রেস খুসী, সম্পূর্ণানন্দ হারলে খুশী হত চন্দ্রভানের কংগ্রেস। অতুল্য ঘোষের কংগ্রেস হেম সান্যালকে হারিয়ে জিতল, প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেস বিধান রায়ের ভোট গোনার দিনে আশায় আশায় দম বন্ধ করে বসেছিল। কংগ্রেস যখন দশটা দলের সাধারণ প্ল্যাটফর্ম ছিল তখন কংগ্রেস বললে তবু একটা মানে বোঝা যেত ; এখন পার্টি হয়ে ইস্তক শুধু কংগ্রেস বললে আর কোনো অর্থবোধ হয় না—তার grace চলে গেছে রয়েছে শুধু কং। অর্থাৎ, কে ? কোন্ ব্র্যাণ্ড ? শ্রীকৃষ্ণ না অনুগ্রহ, চন্দ্রভান না সম্পূর্ণানন্দ বড় তরফ না ছোট তরফ ?

॥ অমূল্য চক্রবর্তী, বিন্দুবাসিনী ষ্ট্রীট ॥

কৃষ্ণমাচারীর বাজেট প্রস্তাব দেখেছেন ? আপনার কি মনে হয় এই বাজেট পাশ করানো সম্ভব হবে ?

সম্ভব হবে না বললেই হল ? বাজেট তো তুচ্ছ, সুকুমার রায়ের সৎপাত্র গঙ্গারাম—যে নাকি উনিশটি বার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে শেষে থেমেছিল—তাকেও যদি কৃষ্ণমাচারীর হাতে তুলে দেওয়া হত, তবে পাশ না করে সে থামত ভেবেছেন ! কৃষ্ণমাচারী কি মানুষ নাকি, সাক্ষাৎ অবতার। রাজা গোপাল আচারী অস্ত গেলেন, কৃষ্ণ মেনন ও যাবেন, থাকবে তখন এই দুয়ের সিন্থেসিস কৃষ্ণমাচারী।

॥ অচলপত্র ॥

॥ অচলপত্র ॥ ॥ ওমিও ॥

॥ নরেন্দ্রলাল বসু, শোভাবাজার ॥

"শয়তানের ভুল নেই"—সত্যি ?

না। শয়তানেরও একটি ভুল হয়, তা হচ্ছে যেটা ভুল নয় তাকে ভুল করে ভুল বলে স্বীকার করা। কেরোসিনের উপর আবগারী শুল্ক চড়ানো এবং নামানো স্মরণ করুন।

॥ আরতি বসু ও জয়তী রায়, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা ॥

মিথ্যা তো তিন রকমের—lie, damned lie, and statistics —সত্য ক' রকমের ?

দুরকমের। সত্য, যেমন বউয়ের কাছে তিন সত্যি; আর আমসত্ত্ব, যেমন প্রেস নোট, ইলেকশন মেনিফেস্টো।

বিধান রায়ের নাম থেকেই নাকি বিধান সভা কথাটা তৈরী হয়েছে, সত্যি ?

তাহলে তো জহরলালের ভয়েই জইর ব্রত চালু হয়েছিল বলতে হয় !

'কত ধানে কত চাল'—জানেন ?

না, জানবার চেষ্টাও করিনি কখনো। কণ্ট্রোলের সময় জানার ইচ্ছে ছিল—কত চালে কত ধান ; আর কণ্ট্রোল উঠে যেতে এখন হিসেব করার চেষ্টা করছি কত টাকায় কত চাল। কিন্তু এ দুটোও জানতে পারছি না সঠিক।

॥ পরেশ মিত্র, কাঁচড়াপাড়া ॥

জহরলাল নেহেরু ইনকাম্ ট্যাক্স কেটে কুটে মাত্র ষোল শ টাকা মাইনে পান, বাস্তবিকই এ অত্যন্ত কম নয় কি ?

তাইতো এবারে ট্যাক্সের বোঝা একটু কমানো হচ্ছে, একটি সন্তানের জন্য যদি তিনশ টাকা আয় মকুব হয়, তবে জহরলালের তো প্রায় চল্লিশ কোটি সন্তান !

॥ বিভূতি সেনগুপ্ত, রাইটার্স বিল্ডিংস ॥

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর rythmic method একটু বুঝিয়ে দেবেন ?

ও কিছু নয়, খুব সোজা। একটি ছেলে একটি মেয়ে, একটি ছেলে একটি মেয়ে ; কিংবা দুটি ছেলে একটি মেয়ে, অথবা তিনটি মেয়ে একটি ছেলে, তিনটি মেয়ে একটি ছেলে ; যে কোন ভাবে ছন্দ বজায় থাকলেই হ'ল। আমার এক প্রতিবেশী তো চোদ্দটি বাচ্চাতে গিয়ে rythm পুরো করেছে—ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর rythmic সনেট আর কী !

॥ আবদুস সিদ্দিক, কলিকাতা-২৭ ॥

কাশ্মীরের শেষ পর্যন্ত কী হবে ?

ভারতের যা হয়েছে তাই ("কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ" !)
—পার্টিশান !

ই, এম্, এস্, নম্বুদিরিপাদের পুরো নাম কী জানেন ?

Exigency Modified Socialism নাম্বুদিরিপাদ !

বুলেটের বদলে ব্যালট দিয়েই কেরালায় কম্যুনিজমের পত্তন

॥ অচলপত্র ॥

হয়েছে সত্য ; কিন্তু দরকার হলেই যে সেখানে হাঙ্গেরীর মত ব্যালটের বদলে বুলেট চলবে না তার গ্যারাণ্টি কী ?

গ্যারাণ্টি রাষ্ট্রপতির "বিশেষ ক্ষমতা", যা বিনা নোটিশে ত্রিবান্দ্রামের সেক্রেটারিয়েটে—ব্যালটও না বুলেটও না—TO LET ঝুলিয়ে দিতে পারে ; আপনি না জানলেও নাম্বুদিরিপাদ ভাল করেই জানেন তা।

॥ স্বপন কুমার ঘোষ, রসারোড সাউথ ॥

রাজকুমারী অমৃত কাউরের এবারকার বাজেটের সমালোচনা অতীব সেন্সির্, আশ্চর্য। এই যে গত পাঁচবছর মন্ত্রীত্ব করার সময়ে এই সেন্সির্ কথাগুলো রাজকুমারীর মাথায় আসেনি। কেন বলতে পারেন ?

নুনের ট্যাক্স বসানোর প্রস্তাব হয়ত মাথায় এসেছিল, মুখে আনেন নি ; রাজকুমারী তখনও যে জহরলালের নুন খাচ্চেন ! আর প্রহিবিশন তুলে দেবার প্রস্তাব মাথায় না আসাই স্বাভাবিক : ক্ষমতার নেশায় যখন কেউ মজে, মদের নেশার মজা তার মনে পড়বে কী করে ?

॥ নির্মল সেনগুপ্ত, ঢাকা ॥

ভাসানীর মওলানা কি পাকিস্তানের গান্ধী হতে চাইছেন ?

বোধ হয় না, এখনো ভাসানী তাঁর দলের চাইতে বাংলা দেশকে বেশী ভালবাসেন।

॥ কল্যাণ মুখার্জী, কলিকাতা-২৯ ॥

কমিউনিষ্ট পার্টি অব সোভিয়েট ইউনিয়নের বিংশতিতম কংগ্রেসে পঠিত বলে যে তথাকথিত "ক্রুশ্চেভ রিপোর্ট" নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তা পড়ে মহান ষ্টালিন তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের যে সকল ভাড়াটে কুৎসা রটনা-কারীরা বেসামাল হয়ে লম্ফঝম্প করেছিল, আজ কমরেড ক্রুশ্চেভ যখন সেই রিপোর্ট জাল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, তখন তারা চুপ কেন ?

॥ চিঠিপত্তরের জঞ্জাল ॥

তারা সম্ভবতঃ একবিংশ কংগ্রেসের অপেক্ষায় আছে, যখন এই ক্রুশ্চেভ সেই ক্রুশ্চেভকেই জাল বলে উড়িয়ে দেবে !

॥ দেবব্রত সিংহ রায়, বাটানগর ॥

মার্শাল আর ক্রিসমাস দ্বীপগুলো কোথায় জানেন মশায় ?

আমেরিকা আর ব্রিটেন তো বলছে এখনো পৃথিবীতেই আছে, সত্যি মিথ্যা ঈশ্বর জানেন !

ভারতের সুনামের মূল হল তার পররাষ্ট্রনীতি, আর পাকিস্তানের ?

মার-লোষ্ট্র-নীতি !

আমেরিকায় কি কমিউনিষ্ট নেই ?

ছিল, ম্যাককার্থি সাহেব মারা যাবার পরে আর নেই !

বিয়াল্লিশের রোমাঞ্চকর নেত্রী অরুণা দেবীর (আসফ আলি) খবর কী ?

শ্যাম-কুল দুই হারিয়ে এখন করুণা দেবী হয়ে আছেন কোথাও !

॥ হরপ্রসাদ দাস, কটক ॥

নেতাজী আছেন কি নেই ?

এ্যাদ্দিন যদিও বা থেকেছিলেন, কিন্তু এখন শাহ নওয়াজ কমিশনের মেজরিটি রিপোর্ট দেখবার পরে কী করে বেঁচে থাকতে পারেন নেতাজী ? গণতন্ত্রের খাতিরেই পারেন না আর !

॥ সুনীল বর্ধন (কাশীপাড়া লেন, শ্রীরামপুর) ॥

জুহরলাল, জওহরলাল, জোয়াহরলাল, জবহরলাল—কোনটা ঠিক ?

কোনটাই নয় ; আসলে হবে Jobহরলাল,—Job হরণ করে বেকারত্ব বুদ্ধির গৌরবে যিনি লাল ।

হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক হয় এবং যায় কিসে ?

[কুকুরে কামড়ালে হয়, শনিবারের চিঠিতে প্রসঙ্গকথা]

॥ অচলপত্র ॥

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে হোমার রসিকতা পড়লে, রবিবার সকালে আকাশ বাণীর সঙ্গীত শিক্ষার আসর, সতীনাথের রেকর্ড, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনলে জলাতঙ্ক না হক, আতঙ্ক কিছু কম হয় না। জলাতঙ্ক ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে সময়ে গেলে সেরে যায়। পরে যে আতঙ্কের কথা লিখেছি সেগুলি বন্ধ না হলে সে ভয় যাবার নয়!

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল,—সত্য?
কেরালা তার প্রমাণ দেবে!

॥ রমা রায় (রাসবিহারী বীথিকা, কলকাতা) ॥

বিকাশ রায়ের নূতন প্রভাত দেখেছেন?

গুণের বিকাশের চেয়ে সাময়িক Cash-এর প্রতি যাঁর আকর্ষণ অনেক বেশী সেই বিকাশ রায় লিখিত চিত্রনাট্যায়িত পরিচালিত অভিনীত নূতন প্রভাত দেখেছি। দেখে মনে পড়েছে গুণ্ডার আড্ডায় ছোট ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রথমে হাত, পরে পকেট, তারপর ঘর সাফাই; এবং তারপর ধাপে ধাপে সিঁদকাটা, সিন্দুক ভাঙা এবং সব শেষে খুন খারাপা করানোর শেষ বিদ্যায় পাকা করে তোলার কথা। বিকাশ রায় প্রথমে পার্শ্বচরিত্রে তারপর ভিলেন তারপর হিরো ক্রমশঃ প্রযোজক, পরিচালক, এখন আবার কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারও। এরপর নায়িকার ভূমিকাতেও বিকাশের নাম দেখতে পেলেই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা সার্থক হয় সম্পূর্ণ! বিকাশের অসম দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হইনি, হেসেছি। হেসেছি সন্ন্যাসী ও মূষিকের গল্পটি মনে করে। মার্জারভীত নেংটি ইঁদুর সন্ন্যাসীর কৃপায় বিড়াল হয়ে ভয় করতে আরম্ভ করল কুকুরকে; বিড়াল থেকে সে হল কুকুর ওই সন্ন্যাসীরই দয়ায়; ক্রমশঃ বাঘ হয়ে যেদিন সে সন্ন্যাসীকে খেতে এল সেদিন সন্ন্যাসী বললেন: পুনর্মূষিকোভব। তাই ভয় নেই আমার শুধু বিকাশ রায় তাঁর ছবির নাম নূতন প্রভাত দিলেন কেন এইটেই বোধগম্য হয়নি। নাম দেওয়া উচিৎ ছিল: নূতন অরুন্ধতী। প্রভাত

ত তেমনি আছে 'মা' হবার আগে ও পরে! নূতন হচ্ছে ত অরুন্ধতী, চলাচল থেকে টাকা-আনা-পাই-য়ে ; টাকা-আনা-পাই থেকে পঞ্চতপায়।

॥ সরিৎ দত্ত, (গোপাল ঘোষ লেন, কলিকাতা) ॥

'নেহেরুর রাজত্বে 'হনুমানে' মন্ত্রী হল শেষে'—এর পরের লাইন কি বলুন তো ?

Man-এ নয়, হনুমানে মানে যারে নেরু ছাড়া কে সে ?

নির্মল চন্দ্র চট্টোর পরাজয়ের পরও কি আপনি বলবেন বাঙ্গালী আবার দাঁড়াবে ?

দাঁড়াবে ! ছিন্নমস্তার মত নিজের রুধির নিজে পান করে !

আমরা এমন কি সামান্য কোন বিষয়ে চার ভাইবোন একমত হতে পারিনা আর কমিউনিজম গ্রহণকারী সব শিয়ালের এক রা ?

যতদিন মড়া পায় না ততদিন এক রা। কেরালার পর এক রা থাকবে না আর, তখন সবাই ড্যাকরা !

পাকিস্তানে হিন্দুরা সাফ হয়ে যাবে আর হিন্দুস্থানে থুড়ি ভারতে মুসলমানরা সেই রোখ নিয়ে থাকবে ?

এই···এই···! রোখ্‌কে ! একদম কম্যুন্যাল হ্যায়···!

পুনরায় অচলপত্র প্রকাশ করবার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

করলাম। কিন্তু এটাও কি আপনার প্রশ্ন ? কিম্বা হয়ত ঠিকই ! অচলপত্র বেরুবে কি বেরুবে না এ প্রশ্ন অচলপত্রের শত্রুমিত্র সকলেরই ! এবং এবার থেকে ইংরাজি মাসের পয়লায় প্রতিবার আপনাদের লক্ষ লক্ষ শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে অচলপত্র হাজির হবে কেবল মাত্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর দরজায়। আপনার শরৎচন্দ্রীয় শেষ প্রশ্নের এই হচ্ছে আমার শশধর দত্তজ 'শেষ উত্তর' !

॥ অচলপত্র ॥

॥ প্রতাপ চৌধুরী (আসাম) ॥

আমার পাঁচটি শ্যালক, ভাইফোঁটা সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন ?

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার একখানা অবিকল নকল পাঠিয়ে কিছু ট্যাক্স আদায় করে নিন !

মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের পর সংলাপের মধুরতায় দ্বিতীয় স্থান কার ?

হরিনারায়ণ চট্টপাধ্যায়ের ! তাঁর সংলাপ অবশ্য রাত একটায় ছাড়া শোনা শক্ত !

আপনার কি ফ্লু হয়েছিল, হয়েছে, বা হবে ?

হয়েছিল মানে ? আমি-ই ত কলকাতায় ফ্লু চালু করলাম এক নিদাঘে একজোড়া সিঙ্গাপুরী কলা খেয়ে ! এই ফ্লু ত সিঙ্গাপুর থেকেই এসেছে না ?

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিদের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতির পার্থক্য কি ?

কংগ্রেস সভাপতি হচ্ছেন শুধু পরটা ! প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিরা সবাই প্রায় একেকটি মোগলাই পরটা !

॥ কৃষ্ণা রায় (জলপাইগুড়ি) ॥

খেলা ভাঙার খেলা দেখেছেন ?

হাঁ ! ছবিটির সর্বাঙ্গে 'ফ্লু' এর আফটার ইফেক্ট জ্বলজ্বল করছে।

রেডিওতে শুক্রবার শুক্রবার যে বেতার নাট্যাভিনয় হয়ে থাকে তা কি আপনি শোনেন ?

গান্ধীজি যেমন মৌন দিবস পালন করতেন সপ্তাহে একদিন, আমি তেমন 'বধির দিবস' পালন করি প্রতি শুক্রবার !

॥ নীলা সরকার (ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস, বালিগঞ্জ) ॥

রামমোহনের ওপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কোনও নাটক আছে ?

॥ চিঠিপত্তরের জঞ্জাল ॥

থাকলেও পড়িনি, শ্রীরামচন্দ্রের ওপর কোনও শ্রীরামছাগল কিছু লিখলেও আমি তা পড়তাম না !

সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল বাঙ্গালী লেখক বর্তমানে কে ?

সমরেশ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। সমরেশ স্লো এবং স্টেডি হলে রেস সেই জিতবে। জীবনঅভিজ্ঞ এই লেখক নিজের অভিজ্ঞতার অঙ্গন পার হয়ে লিখতে গেলেই ভুল করবে ; কিন্তু তা না করলে, ভাষা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া সত্ত্বেও, শুধু মাত্র সাহিত্যে সত্যকারের 'জীবন'কে উপস্থিত করার কৃতিত্বে, যে জীবন ব্যাপক, বিশাল বিচিত্র অর্থাৎ বহুমুখী,—সমরেশের সঙ্গে, এক সঙ্গে নাম উচ্চারণ করা যায়, এমন নাম আমার এই মুহূর্তে আর স্মরণে আনা অসম্ভব। জ্যোতি-রিন্দ্রর লিখনভঙ্গী, ভাষাবিন্যাস এবং উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পূর্ণ দখলে। অকারণ, অপ্রয়োজনীয়, অশালীন, অশোভন, অশ্লীলতার দায় থেকে এই মুহূর্তেই মুক্ত হতে পারলে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বারো ঘর একটি উঠোন, —এই স্মরণযোগ্য বাঙলা বইয়ের রচয়িতা, দীর্ঘস্থায়ী সৃষ্টির সুনিশ্চিত পরিণতিতে ইতোমধ্যেই উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির দুর্লভ লেখক !

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অভাব কি ?

সৎ সমালোচকের। বন্ধুর মুখ চেয়ে, বিজ্ঞাপনের মুখ চেয়ে, প্রকাশকের মুখ চেয়ে কৃত অসৎ সমালোচনাই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অশেষ দুর্গতির একমাত্র কারণ ! বাংলা সাহিত্য যদি আজ বন্ধ্যা হয়ে থাকে তার কারণ আর কিছু নয়, তার কারণ বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা আজ নির্বীর্য। চরিত্রবান সমালোচনা, ব্যক্তিত্ববান সমালোচনা শুধু ভুল দেখায় না, পড়ে থাকা প্রতিভাকে তুলেও ধরে। এবং সেরকম সমালোচক আজ একজনও থাকলে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অদ্বৈত মল্ল বর্মন (তিতাস-একটি নদীর নাম), কবি দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধকার দেবীপ্রসাদ চট্টো, অমলেন্দু দাশগুপ্ত,— দের নাম এবং রচনাই পাঠকদের প্রথম স্মরণে আসত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে লেখা প্রায় বন্ধ করেছেন। একমাত্র তাঁকে বলি দেবার কারণই সাহিত্য থেকে রাজনীতিকে দূরে

রাখার পক্ষে যথেষ্ট। আরেকজন,—বিনয় ঘোষ, তিনি অবশ্য স্বীকৃতি পেয়েছেন, তবুও যা পাওয়া উচিৎ, তার তুলনায় কিছুই পান নি। রবীন্দ্র পুরস্কার তাঁকে পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতির জন্ত দিলে একটি কর্তব্য অন্তত সঠিকভাবে পালিত হবে ;

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ওপর সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাব কিসের ?

সংস্করণের। দ্রুত সংস্করণ ছাড়া বইয়ের যেন অন্ত আর কোনও সার্থকতা নেই, প্রকাশকের এই সুস্পষ্ট তাগিদ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে শক্তিমানতম লেখকদের ওপরেও। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সব চেয়ে বড় ভিক্টিম। পাণ্ডিত্য এবং রসিকতার দুলর্ভ মনিকাঞ্চন যোগ হয়েছে যাঁর মধ্যে তিনি যখন চটুল ইয়ার্কিকেই সাহিত্যে একমাত্র পরিবেশন যোগ্য মনে করেন তখনই সংস্করণের প্রভাব প্রোজ্জল হয়। দেশে বিদেশে তাঁর রচনা এবং অবিশ্বাস্যও তাঁরই,—বিশ্বাসঅযোগ্য ঘটনা হলেও ত তা সত্য। দেশে বিদেশের সংস্করণ হতে প্রথম প্রথম দেরী হয়েছিল, অথচ পরবর্তী বইগুলির হয়নি, এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে আরেকখানা দেশে বিদেশে রচনার চেয়ে অবিশ্বাস্য রচনায় উদ্যোগী করেছে, এ ভাবা ছাড়া উপায় কি ? অবশ্য সব প্রকাশকেরাই সংস্করণের মুখ চেয়ে বই ছাপছেন না যে, তারও প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। নাভানা, বিহার সাহিত্য ভবন, পুস্তক প্রকাশক (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি), পুথিঘর (তিতাস একটি নদীর নাম), এম. সি. সরকার। নিউ এজের বই যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও তাঁদের নির্বাচনের পেছনে সৎউদ্দেশ্যও ব্যহত নয় সব সময়ে (লোকায়ত দর্শন)। সবশেষে নাম করলেও, ছাপা, বাঁধাই, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়, সব দিক দিয়ে সর্বাগ্রে বাংলা বইয়ের চেহারা ঘুরিয়ে দেবার জন্য যার দাবী অনস্বীকার্য,—সে হল সিগনেট প্রেস ; তাদের নির্বাচন সব সময় যুক্তিসঙ্গত, সাহিত্যসঙ্গত নয় ; কিন্তু কবিতার বইকে পাঠক পাংক্তেয় করে তোলার কৃতিত্বে নাভানা দ্বিতীয় ; সিগনেট অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। সিগনেট প্রেসের প্রকাশনা কৃতিত্বের

সঙ্গে কিন্তু সর্বভারতে আর কারুর কোন তুলনাই চলতে পারে না। পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সিগনেট প্রেস। ভারতবর্ষে সিগনেট প্রেস একাই একটা আলাদা শ্রেণী। শুধু পুস্তক নির্বাচনে প্রকাশক যদি সমালোচক হবার অন্যায় দাবী ত্যাগ করতে পারতেন তাহলে সিগনেট প্রেস হত সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। তা হয়নি, তা হয় না, চাঁদে কলঙ্ক থাকে। গান্ধীর চিঠি প্রফুল্ল ঘোষকে লেখা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়েই।

চিঠি লিখবেন না!

সুবিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক দিলীপ কুমারের বড় বাতিক হল দীর্ঘ পত্রাঘাত করা। তাঁর পত্রে পত্রে ব্যতিব্যস্ত স্বর্গতঃ জলধর সেন একবার লেখেন: দিলীপ, তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ, কিন্তু সংযম শিখ নাই!

পাঠকদের চিঠির জবাব দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত পাক্ষ-পত্রিকার সম্পাদক একজনের পাঠান একটি নাটক পেয়ে লেখককে চিঠি লিখে জানান: It is all work & no play!

বর্ণর্ডশকে দুটি ভারতীয় মেয়ে একটি চিঠি লিখে তার উত্তর চায়। শ জানান, তিনি চিঠির জবাব দেন না। চিঠি লিখেই জানান অবশ্য!

শকে আরেকবার একজন জানায় যে শয়ের রচনা বিনানুমতিতে সে ছাপছে। তাঁকে চিঠি লিখে জানান যে তিনি আইনের সাহায্য নেবেন। তার উত্তরে সে জানায় যে সে ছাপবেই। শ আবার চিঠি লেখেন এই বলে যে এই তাঁর শেষ চিঠি। এবারে পত্রদাতা জানায় যে শ যেন অন্ততঃ আর একটি চিঠি লেখেন, কারণ শয়ের লেখা দুটি চিঠি বেচে সে তার দেনা প্রায় শোধ করে ফেলেছে; আর একটি মাত্র চিঠির ওয়াস্তা,—তাহলেই তার সব দেনা শোধ হয়। শ তাকে আরও একখানি চিঠি লেখেন। তাতে লিখে দেন যারা আগের দুটি এবং এটি কিনবে তারা জানেনা যে তারা জালপত্র দাম দিয়ে কিনছে।

॥ অচলপত্র ॥

CENTRAL LIBRARY

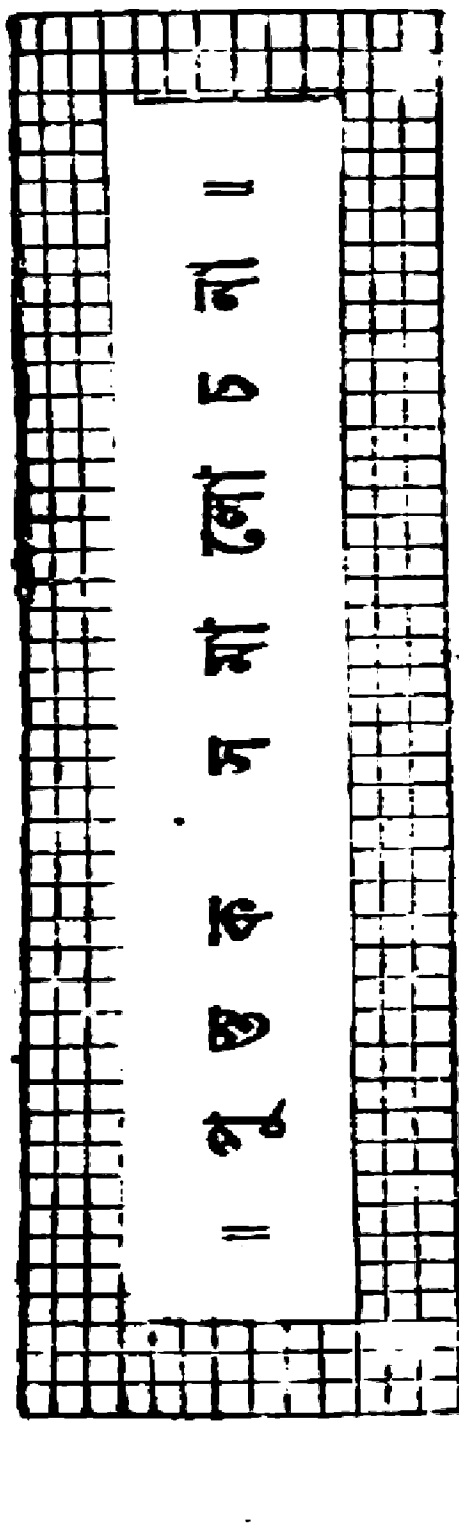

॥ পরিচয় ॥

পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরা গল্প—রুহুল আমীন নিজামী - সম্পাদিত। প্রকাশক — ষ্ট্যাণ্ডার্ড ॥ পাবলিসার্স ॥

এটি গল্প সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থে ত্রিশটি গল্প আছে নানা লেখকের, প্রবীন ও নবীন। সে দিক দিয়া বিচার করিলে সংকলনটি "রিপ্রেজেণ্টেটিভ" ও পূর্ব বাংলার সাহিত্য পরিচায়ক। সম্পাদক ভূমিকা শেষে মন্তব্য করিয়াছেন : সাহিত্য যুগেরই মূর্ত প্রকাশ। এই গল্পগুলি যদি পূর্ব-বাংলার সমকালকে ফুটিয়ে তুলতে পারে তা হলেই তার সার্থকতা. নচেৎ নয়।

মন্তব্যটি বিভ্রান্তিকর, অসার। প্রকৃত সাহিত্য কখনই যুগ-সাহিত্য নয়। যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যই সাহিত্য পদবাচ্য। রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল, কাবুলীআলা, মধ্যবর্তিনী. কখনই যুগের মূর্ত প্রকাশ নয়। 'শিল্পী সমাজ', 'বামুনের মেয়ে', বিগত যুগের বিষয়। তাহা যে সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত তার কারণ তাহা যুগোত্তীর্ণ। একমাত্র 'মহেশ' ও 'শিল্পী' যুগের হইয়াও চির যুগের সাহিত্য হইয়াছে। শরৎচন্দ্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিভা।

এই সংকলনটি প্রকাশিত হইলে অনেকেই ইহার পিঠ চাপড়াইয়াছে কিন্তু অনেক সাহিত্যিক সাধু সজ্জন যে ইহা পড়িয়া বুক চাপড়াইবে তাহাও সুনিশ্চিত। কারণ গল্পগুলি পূর্ব-বাংলার এই স্বাক্ষর লইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও গল্পগুলি ফলতঃ দাঁড়াইয়াছে পূর্ব পাকিস্তানের রূপ লইয়া। বেশীর ভাগ লেখক আত্মবিস্মৃত; ভাষা প্রয়োগে বে-সামাল। তাই মনে সন্দেহ জাগে পূর্ব বাংলায় ভাষার জন্যে যে রক্তপাত হইল তাহার পশ্চাতে সহৃদয়তা ও মাতৃভাষার প্রতি মমতার চেয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতা বা সুযোগ সুবিধার প্রশ্নই যেন ছিল অধিক প্রবল। গল্পগুলির অনেক শব্দ পশ্চিম বাংলায় দুর্বোধ্য এমন কি অবোধ্য বলিয়া গণ্য হইবে; ক্রিয়াপদ বদলাইয়া দিলে গল্পগুলিতে আরবি, ফার্সী ও উর্দুর সহোদরতার স্বাক্ষরই মনে হইবে অধিক স্পষ্ট। অথচ ভূমিকায় সম্পাদককে লিখিতে দেখি: এই সংকলনের লেখক একা হিন্দু ন'ন; আবার একা মুসলমানও ন'ন—হিন্দু মুসলমান দু'জনেই এর ওয়ারিশ। হিন্দু লেখক গোপাল বিশ্বাসও 'জলের পরিবর্তে লিখিয়াছেন 'পানি', 'জল' কি পাকিস্তানে অপাক? 'পানি' অবোধ্য নয়, কেবলমাত্র মুসলমানি শব্দও নয়—হিন্দুস্থানেও সমান বোধ্য ও চলিত। আমাদের আপত্তি 'পানি' বাংলা নয় বলিয়া। এবং পানি শব্দটা চালু করিবার পিছনে একটা জবরদস্তি মনোভাব দেখিয়া। বিখ্যাত ফরাসী গল্প "লাষ্ট লেসন"-এ যে ভাষা প্রীতি সংস্কৃতি প্রীতি বর্তমান তাহা এই সংকলনে অনুপস্থিত দেখিয়া আমরা মর্মাহত, সাহিত্য বিরোধী ধর্মাহত। পানিকে স্বীকার করিলে বৌদ্ধ বাঙালীর পুত্রকে পুত্র' ও ধর্মকে ধম্ম লিখিবার অধিকার স্বীকার করিতে হয় এবং খৃষ্টান বাঙালী গুরুকে 'ফাদার' এবং পিতাকে 'পাপা' বলিয়া চালাইতে চাহিলে বলিবার কি থাকিবে? রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলা বিভক্ত, সাহিত্য ক্ষেত্রেও যদি বিভক্তির পরিধি বাড়াইয়াই চলি তবে কেবলমাত্র বর্ণমালা দুই বাংলার ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারিবে না। পূর্ব বাংলার সাহিত্য বুঝিতে হইলে অদূর ভবিষ্যতে নূতন অভিধান ও নূতন ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য হইয়া পড়িবে এবং 'আসামী'র মত পূর্ব বাংলার সাহিত্য বিদেশী ভাষারূপে 'গৃহীত হইতে বাধ্য। এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমেরিকা ও

ইংলণ্ডের ভাষা অভেদাত্মা। উপরি-উক্ত মন্তব্য বিরুদ্ধ ও রূঢ় হইলেও আমরা উন্মুক্ত কণ্ঠেই বলিব বেশীর ভাগ গল্প লেখক শক্তিমান। তাঁদের বাদ ও বিবাদস্পৃহা স্তিমিত হইলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি যে তাঁরা করিতে পারিবেন সে সম্ভাবনা আছে। ধর্মান্ধতা দূষ্য মনে করিলেও ধর্মানুরক্তি নিশ্চয় দূষ্য মনে করি না। নিম্নে আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিতেছি।

প্রথম গল্প জন্মান্তর, লেখক আবুল ফজল। গল্পের নায়ক মোহাম্মদ হোসেন হাফেজ ও আলেম। তিনি ধর্মপ্রাণ, এমন ধর্মপ্রাণ যে তাঁর রুগ্না স্ত্রী পুরো নামাজ না পড়াতে বিরক্ত! বে-নামাজীর চোহবৎ তিনি এড়াইয়া চলেন! কিন্তু এ হেন ধার্মিক মৌলানা এক বিকলাঙ্গ আশ্রিতার অঙ্গশ্রীতে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতভাবে জড়াইয়া পড়িলেন। প্রণয়ের অনভিষ্ট ফলোৎ-পাটনে বিকল হইয়া আশ্রিতাকে বিবাহও করিয়া ফেলিলেন। এই অসামাজিক অসঙ্গত কাণ্ডে তার স্বচ্ছল জীবনে বিপর্যয় আসিল এবং পরিশেষে একেবারে লাঙ্গলস্কন্ধ চাষী হইয়া পড়িলেন। হোসেনের জন্মান্তর গ্রহণে একমাত্র সমর্থক কলেজে পড়া তাহার প্রথম পক্ষের শ্যালক কবির। কবির দৃপ্তকণ্ঠে মৌলানা হোসেনকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত করিবার ছলে বলে: মেহনতী মানুষের দিন আসবেই, না এসেই পারে না। কারণ মেহনতী মানুষেরাই গড়ে দুনিয়া। আর সব দেশের চাষীই হচ্ছে সে দেশের মেরুদণ্ড—মওলানা-মৌলবী নয়, পাদরী পুরোহিত নয় এমন কি উজির নাজিরও নয়, চাষীই—আপনি সেই মেরুদণ্ডের অংশ হয়েছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য ছোকরা কবির এই মেরুদণ্ডের অংশভার না লইয়া বক্তৃতা বাগীশ হইল কেন?

শুধু চাষী নয়, মওলানা-মৌলবী, পাদরী পুরোহিত, উজির-নাজিরও দেশের মেরুদণ্ডের অংশ। দেহের প্রতিটি অঙ্গ শক্ত সবল না থাকিলে যেমন স্বাস্থ্য অটুট থাকে না তেমনি জাতির প্রতিটি অংশ শক্ত সবল না হইলে জাতির মেরুদণ্ড খাড়া থাকে না, সর্ব অঙ্গ সুন্দর হইলেই তবে মানুষ ও জাতি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

গল্পটির প্রধান অন্তরায় গল্পটিতে উচ্ছ্বাস আছে, লজিকের নির্যাস অনুপস্থিত। ইংলণ্ডে 'ইনডাসট্রিয়াল রিভলিউসন' আসিলে চাষবাস ক্ষতি-কর আন্‌প্রফিটেবল? বিবেচিত

হইয়াছিল। এখনও ইংলণ্ড খাদ্য-সম্ভার কিনিয়াই খায় কিন্তু রপ্তানী করে শিল্পসম্ভার এবং তাহাতেই ইংরাজ জাতি জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়াছে। মতবাদ প্রচারের সময় মনে রাখা কর্তব্য কোন্ বাদ বা নীতি ব্যক্তি বা সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু আমাদের স্বল্প শিক্ষিতের মাথা খাইতেছে আপাত-মধুর মার্ক্সীয়বাদ ও 'গুড আর্থের' উদ্দেশ্যমূলক 'ব্যাড ফ্যালেসাস' তত্ত্ব। চীনকে এগ্রি-কালচারাল দেশ প্রতিপন্ন করিবার মূলে রহিয়াছে তাকে চিরদরিদ্র, শিল্প বিমুখ করিয়া রাখিবার দুরভিসন্ধি। রাশিয়া যে এ্যাংলো-আমেরিকাকে সুয়েজের ব্যাপারে সদম্ভ উক্তি করিয়া বসিল তাহার কারণ সে কৃষি শিল্পে উন্নত বলিয়া নয়, এটম শিল্পে সে উন্নত বলিয়া।

আবুল ফজল সাহেব প্রবীন লোক, তাঁহার এ বিষয়ে কাছাখোলা হইবার কথা নয়। তবে এক কথা, লুঙ্গীর কাছা নাই? লেখক কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার গল্পের আদর্শে দেশশুদ্ধ লোক চাষী হইলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে? যে নীতি বা আদর্শ সর্বাঙ্গসুন্দর নয় তাহা সর্ব-জনগ্রাহ্য হয় না। তদুপরি প্রথমা স্ত্রী ফরিদার কথা হোসেনের শ্যালকের মত লেখকও বিস্মৃত হইয়াছেন। পরিবারে ফরিদার স্থান কোথায়? এক অন্যায়কে আর এক অন্যায়ের সাহায্যে অন্যায়-মুক্ত করা যায় না। গল্পটি অসার্থক। দ্বিতীয় গল্প 'আবহাওয়ার আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও বিদগ্ধ। গল্পটিতে শরৎচন্দ্র ও ওয়াজেদ আলী সাহেবের প্রভাব আছে অনুমান করি। গল্পে লেখক একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন —হরি রাম হরি রাম হরি হরি রাম রাম নয়, বিশুদ্ধ পদ হইবে—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—'হরি' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' হয়।

তৃতীয় গল্প 'নতুন জন্ম'-এ প্রথম গল্প 'জন্মান্তর' পুনর্জন্মলাভ করিয়াছে। কবির আকাশ হইয়া এখানে দেখা দিয়াছে, আর হোসেন যেন ফরাজ আলি। মাঝি জীবনের দৈন্যদুঃখে প্রপীড়িত কিশোর আকাশ নিরুপায় অসহায় পিতাকে বলে—শহরে যামু (মানে মাঝির বৃত্তি ত্যাগ করিবে)—চুরি করমু, ডাকাতি করমু, কাম করমু —নিরক্ষর মাঝি ফরাজ আলি হোসেনের এককালীন ধর্মপ্রাণতার আন্তরিকতা লইয়া পুত্রের অন্যায় সংকল্পের প্রতিবাদচ্ছলে বলে—মরদের বাচ্চা, চুরী ডাকাতী করতা চাস, শরম করে না, শরম করে না?—

প্রথম গল্পের আলেম হোসেন নিরক্ষর মাঝি করাজ আলির কাছে যে পরাজিত তার কারণ অক্ষর জ্ঞান শূন্য হইয়াও করাজ আলি স্বাভাবিক ধর্মপ্রাণতার অক্ষয়বৈভবে সমৃদ্ধ ও পূর্ণ। নতুন জন্ম গল্পটি প্রায় প্রথম শ্রেণীর হইয়াছে—বিকাশে ও প্রকাশে; second class first তো বটেই!

সংকলনের সেরা গল্প হইল 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ও 'পথ জানা নাই।'

তুলসী গাছের কাহিনীর শেষাংশে একটি পরম ও চরম তত্ত্ব অতি সরল উক্তিতে প্রকটিত :—তুলসী গাছকে মানুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে অর্থাৎ যার (তার?) বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার শক্তির উপর নির্ভর করে না।

বাক্যার্থ ও বাচ্যার্থ উভয়বিধ গুণে গল্পটি উপভোগ্য।

"পথ জানা নাই"—এর উপসংহারও সমান উপভোগ্য :—

সকলে প্রশ্ন করিল—আহা হা, এ কর কি গহরালি—

—ভাঙতে আছি। '(মানে নতুন শড়ক) হাত না থামাইয়াই, চোখ তুলিয়া না চাইয়াই গহরালি জবাব দিল।

ক্যা?

ভুল ভুল অইছিল এ রাস্তা বানাইন্যার। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না। কোদাল চালাইবার কাঁকে কাঁকে গহরালি যেন আত্মগতভাবেই কথাগুলি বলিয়া যায়। গহরালিরা কেবল নতুন রাস্তাই ভাঙিবে না, অনেক নূতন বাদ অনেক বিবাদের বাসভূমি পুরাতন ইমারৎও ভাঙিবে। এই ভাঙাগড়াই জীবন এবং জীবন মানেই গতিশীলতা।

পূর্ব পাকিস্থান নূতন রাষ্ট্র; তার সাহিত্য জাতিকে নূতন শক্তি উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সমৃদ্ধ, উন্নত করুক ইহাই কাম্য।

॥ অচলন্তিকা ॥

যন্ত্রস্থ : যন্ত্রস্থ কথার সঠিক অর্থ হচ্ছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুস্তক [নূতন অভিধান]।

॥ পুস্তক সমালোচনা ॥

সাহিত্য দুঃসংবাদ

॥ বিংশ শতাব্দী ॥

চলমান বিংশ শতাব্দীর নাম মাহাত্ম্য শোষণ করে ইদানীং আরেকখানা মাসিকপত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। "বিংশ শতাব্দী"র কথাই বলছি। ভরসার কথা, এই কাগজটি বর্তমান উন্নাসিকতার যুগেও হজুগে-সাহিত্যের নামে নোংরামিতে নামেনি।

বিংশ শতাব্দীর বুকের ওপর "বিংশ-শতাব্দী" কাগজখানা "ঘরের ভেতর মশারি" তুল্য। মশারি মশার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়, আশা করেছিলাম, "বিংশশতাব্দী"ও তেমনি সাহিত্যের গুরু-'মশা'য়দের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবে। নবীনের শিবিরে স্থবির দু' একজন লিখিয়ের অনধিকার প্রবেশ, "বিংশ শতাব্দী"র মাহাত্ম্য খর্ব করেছে বলেই আমাদের ধারণা।

"বিংশ শতাব্দী"ওয়ালাদের একটা ধারণা নিশ্চয় স্পষ্ট নয়। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর পার্থক্য যে নিছক উনিশ-বিশ নয়, বরঞ্চ তার চেয়েও বেশ কিছু বেশী, আকাশ পাতাল—এই সহজ সত্যটি বোধ হয় তাদের বিস্মরণ হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর কবিকল্পনার আকাশগঙ্গা আজ মর্ত্যভেদ করে পাতালগঙ্গা ভোগবতীরূপে প্রবাহিত। বিংশ শতাব্দীর ভোগৈশ্বর্যময় পৃথিবীতে, "সত্য"ই একমাত্র 'সুন্দর'। 'সুন্দর'কে আমরা সব সময় 'সত্য' বলে গ্রহণ করতে পারছি না। বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষতার সুর তাই অহরহ আমাদের কানে বাজছে। 'বিংশ শতাব্দী'র কয়েকটি পৃষ্ঠায় এই প্রত্যক্ষতার সুর কেমন যেন বেসুরো।

কারণটি খুবই স্বচ্ছ। প্রগতিশীলতার ধারক হলেও 'বিংশ শতাব্দী' গতানুগতিকতার বাহক। ঐতিহ্যপ্রিয়তার ভীরুতা তার সর্বাঙ্গে। এদের এক পা বিংশ শতাব্দীতে, আরেক পা. উনবিংশে। আরেক পা বরং পড়া উচিত ছিল একবিংশ শতাব্দীতে। তা'তে বিশ্বজীবনে আরো এক পা এগিয়ে যাওয়া যেত।

কাগজটির নামকরণ ভালো। কিন্তু কে না জানে 'বিংশ 'শতাব্দী'তে নাম করা এক দুরূহ ব্যাপার। গত বৈশাখ সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী' আকৃতিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। হলে কী হবে, এর প্রকৃতিতে আমরা তেমন হৃষ্ট ও তুষ্ট হতে পারিনি। এর ঘোষণাপত্রে 'অনেক বেশী' পৃষ্ঠা সংখ্যা

যেন বড় বেশী নির্লজ্জভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত ছিল যে, সাহিত্যজগতে পৃষ্ঠা-প্রদর্শন, স্থায়িত্বের জগতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পূর্বাভাস মাত্র।

ঐ কাগজেরই ঘোষণাপত্রে আবার: 'বিষয়বৈচিত্র্যেও বিংশ শতাব্দী সর্বাগ্রগণ্য' এ যেন নিজের টাকে ঢাক পেটানো। 'বিষয়'বৈচিত্র্য থাকলেই যদি সর্বাগ্রগণ্য হওয়া যেত, তাহলে যে দৈনিকপত্রিকার দাবীই সর্বাগ্রে মেনে নিতে হয়। 'বিষয়'-বুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাধারা বিষাক্ত সাহিত্যেরই সৃষ্টি করে।

'বিংশ শতাব্দী'তে নির্বিচারে প্রবীণ ও নবীনের একটি বিশৃংখল জোটের, তথা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বিংশ শতাব্দীর মূল কথা, 'সীন্থেসিস্'। এই জিনিষটীর অভাব ঘটেছে, ভিন্ন-শৈলীর রচনার বিক্ষিপ্ত বিন্যাসের ফলে। সন্দেহ নেই, নানা সমস্যা বিজড়িত বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য শুধুমাত্র হৃদয়বল্লভই নয়, বহুবল্লভ। এদিকে, 'বিংশ শতাব্দী'র সাহিত্য বহুমুখীই হয়েছে, বহুবল্লভ হয়নি। কাগজখানার আপাদমস্তক বেহালার পাচনের মতই বিস্বাদ। কবিরাজী মন নয়, সম্পাদকের কবিমনের স্থি-শীলতাই আমরা বিশেষভাবে আশা করেছিলাম। কারণ যুগকে যুগাতীত হয়ে দেখা, কবিপ্রতিভা-সাপেক্ষ। 'বিংশ শতাব্দী'র সম্পাদক আমাদের দিতে পারছেন না এই শতাব্দীর 'message of life.' হয়তো বিংশ শতাব্দীর যুগ উপলব্ধিই ঘটে ওঠেনি তাঁর। 'জ্ঞানপাপী' হতে হলে কী অমনি করেই চোখ কান বুজে অজ্ঞান হয়ে থাকতে হয়? সম্পাদককে অবশ্য একটি বিষয়ে ধন্যবাদ দিতেই হয়। নোংরামিতে নামেননি তিনি। দলাদলির উর্ধ্বে তাঁর অবস্থিতি।

বৈশাখ সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'তে উদীয়মান সব লেখকই এক-খামচি করে লিখেছেন। সব মিলিয়ে অদ্ভুত রসের পঞ্চব্যঞ্জন। ইংরাজীতে একেই বোধ হয় বলা হয়েছে, 'what-not.'

বর্তমান শতাব্দীর বুভুক্ষু পাঠকের জবর চাহিদা হচ্ছে গল্প। এই নিদারুণ সফিষ্টিফিকেশনের যুগে, গল্পই জীবনের একমাত্র সিমপ্লি-ফিকেশন। বিংশ শতাব্দীর মানুষ, শুধুই দেহসর্বস্ব নয়, মনসর্বস্ব। তাই মানবের এত বীভৎস বিকৃতি। আজকের মানুষ অর্থসর্বস্বও বটে। কিন্তু তাই বলে সে কী অর্থপিশাচ?

মার্ক্স ও ফ্রয়েডের চেয়ে, শিল্পীর চোখে, জীবনের ব্যাপ্তিই কী আকর্ষণীয় নয়? দুঃখের বিষয় 'বিংশ শতাব্দী'র দু' একটি ছাড়া, সব গল্পেই আমরা জীবনকে খণ্ডিতরূপে পাচ্ছি। আশার চেয়ে এতে আশংকাই বেশী।

বিমল করের 'পুতুলের ভগবান'। মনস্তত্ত্ব সত্ত্বেও তেমন দাগ কাটতে পারেনি। বক্তব্যের ভংগীটি নিতান্ত অগভীর, বিবর্ণ। ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত ঐ অর্থরূপী ভগবান বিমল করের কাঁধে ভূত হয়ে না চেপে বসে আবার। সমীর মুখোর 'খাদ ও নিখাদ' গল্পের বক্তব্যটি জীবন্ত। সাধারণ ব্যক্তি মাত্রই দেহগত প্রাণ। মনের অস্তিত্ব হঠাৎ কখনো টের পায় তারা। জলে ভিজতে ভিজতে লতা তার জানোয়ার স্বামীকে ফস্ করে বলে বসেছে শরীরটাই আসল কী বল? মন-টন কিছু নেই। এঁা—সত্যিই তো নেই। মন-টন যে কোথায় থাকে ভাবতে গেলে সমস্ত দেহটাই টনটন করে ওঠে।

বিংশ শতাব্দী দেখছি 'চিত্তরঞ্জনের কারখানা'। তিন-তিনজনের লেখা বেরিয়েছে। চিত্তরঞ্জন দেব, চিত্তরঞ্জন পাল, চিত্তরঞ্জন ঘোষ। শেষোক্ত লেখকের 'কঙ্কা' একাংকিকা বাংলানাট্য সাহিত্যে একটি সুশোভন সংযোজন। মেয়ে দেখার নামে অপমানজনক পরিস্থিতির পিঠে কষে চাবুক চালিয়েছেন নাট্যকার। তাঁর লেখনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

প্রায় ঐ একই মর্মে আরেকটি গল্প—সুশীল সিংহের 'পাড়ি'। গল্প হিসাবে সুন্দর। ভাষা মনোহারী! গল্পের পাড়ি জমাতে না জমাতে শেষ হয়ে যায়। ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাসের ভেতর দিয়ে বিয়ে না হওয়ার সমস্যার ভয়াবহ স্বরূপ-উদ্ঘাটন তাঁর লিপি-কৌশলে চমৎকার উৎরেছে। লেখক যাচ্ছেন পাত্রী দেখতে। ট্রেণে। একদা বাঞ্ছিত এক পাত্রী মীরার সঙ্গে ঐ ট্রেণেই দেখা। অদৃষ্টের পরিহাস আর কী! আজকাল কনেদেখার ফ্রাষ্ট্রেশনে যারা ভুগছেন, মাঝে মাঝে তাঁরা হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করলে ঐ ধরণের হঠাৎ আলোর ঝলকানির সাক্ষাৎ পেতে পারেন।

সমরেশ বসুর জগদ্দল প্রকাশিত হচ্ছে ক্রমশঃ। ক্রমশই হয়তো সমরেশবাবুর বুকেই একদিন তা জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসবে। সমরেশবাবুর স্লো-'রেশ' সম্বন্ধে আমরাও ক্রমশঃ হতাশ হচ্ছি।

আশাদেবী বিরচিত 'পত্নী গর্বিত

কর্তা' আসলে পেত্নীগর্বিত একটি ভূত মাত্র। গল্পটী ভাববাচ্যে লেখা নয় তো?

বাণী রায়ের 'প্রহর হলো শেষ' গল্প নয়। গাল্পনিক। গল্পটির নাম হওয়া উচিত ছিল, 'প্রহার হলো শেষ'। কার প্রহার? তা' আমরা নাই বা জানলুম। এহেন রচনা সম্বন্ধে বাণী রায়ের মৌন থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

বিনয় ঘোষ তো দেখছি ক্রমশই বিনয়ের অবতার হয়ে উঠছেন। এতদিন জানতুম, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি'। এখন দেখছি ঠিক উল্টোটাও হয়—'বিনয়ং বিদ্যাং দদাতি।' বিনয়বাবু আমাদের যে ভাবে বিদ্যা দান করছেন, তা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বাংলা গল্প সাহিত্যের আলোচনায় তিনি ক্রমশই আদিম অবিদ্যার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। অতএব, সাধু সাবধান।

৺মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন অশোক গুহ। এতদিন বাদে অশোক গুহ মানুষ হলেন। বিদেশী গল্পের অনুবাদ চালিয়ে তিনি বোধ হয়, তাঁর ভেতরকার মানুষটিকে গুম করে রেখে-ছিলেন। অশোক গুহের আলোচনার ফাঁকে আমরাও জানতে পারি ৺মানিক বাবু কত বড় মানুষ ছিলেন? হ্যাঁ মানুষের মত মানুষ!

৺দক্ষিণারঞ্জন প্রসঙ্গে গিরীনবাবুর সময়োচিত গবেষণামাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। Form ও Content—উভয় দিক দিয়েই প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। রূপ কথার পর্যালোচনায় আমরা এই রকম মিষ্টিমধুর লেখনীরই প্রত্যাশা করি। গিরীনবাবু, 'বিংশ শতাব্দী'র লেখক। হয়তো কস্মিন-কালেও 'পাঠক' নন। এই কাগজটির সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় একটি ধৃষ্ট উক্তি:—'বিংশ শতাব্দী'র বোধ করি, এমন একজনও পাঠক নাই, যিনি দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমার ঝুলি পড়িয়া মুগ্ধ হন নাই।

আমাদের বক্তব্য:——'বিংশ শতাব্দী'র পাঠক না হলেও 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়ে মুগ্ধ হবার অধিকার সকলেরই আছে। তা'ছাড়া 'বিংশ শতাব্দী'র পাঠক মুষ্টিমেয়, 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পাঠক প্রায় সকলেই।

'বিংশ শতাব্দী'তে প্রকাশিত কবিতার কথা এখানে অনালোচ্য। গদ্যময় বিংশ শতাব্দীর গদ্য কবিতা এখনো পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরভুক্ত।

একটি মাত্র কবিতা—তাও পুরানো সনেট-বন্ধনে—'একুশের কবিতা' ভাব ও ভাষায় হরগৌরীত্ব লাভ করেছে। কবি বোধ হয় প্রাগ্রসর প্রেরণায় একবিংশ শতাব্দীর কথাই বলতে চেয়েছেন। কবি অসিত-কুমারের দূরদৃষ্টিকে ধন্যবাদ।

সাম্প্রতিক সাহিত্যে নূতন হৃদয় হৃদয়সংবাদ নিয়ে এসেছে, 'রম্যরচনা', কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রসরচনার সঙ্গে রম্যরচনার পার্থক্যটি লেখকরা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। রসবাদী ও রম্যতাবাদীদের বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। রসবাদীরা, মূলতঃ ধ্বনিবাদী। তারা রসধ্বনিকেই প্রাধান্য দেন, আর রম্যতাবাদীরা দেন রমণীয়তাকে। প্রাচীন আলংকারিক জগন্নাথ তাঁর 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে বলেছেন : 'রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দং কাব্যম্' জগন্নাথের এই রম্যতাবাদিই বিংশ শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। রম্যরচনা আসলে মনন প্রধান দীপ্তিকাব্য। রসরচনাকে বলা যায় ভাব প্রধান শ্রুতিকাব্য। নীলকণ্ঠ বিরচিত 'মিথ্যা এব জয়তে' প্রথমোক্ত শ্রেণীর। অমিয়া সেনের 'রাজধানীতে আছি কেমন' দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। নীলকণ্ঠের রম্যরচনায় মাঝে মাঝে রসরচনার সাক্ষাৎ মেলে। এটা তাঁর শিল্পের অঙ্গহানিসূচক। ভাষা সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের মজ্জাগত উদাসীনতাও এর জন্য কিছুটা দায়ী।

শেষ পর্যন্ত একটি কথা বলে রাখতে হয়। 'বিংশ শতাব্দী'র অহেতুক দাড়িপ্রীতি আমাদের চোখে একটু বিসদৃশ ঠেকেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্র, ওমরখৈয়ামের চিত্র, সচিত্র বার্ণার্ড-শ', এমন কী 'বিংশ শতাব্দীর বাঙালী' লেখক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের রচনা ছাপানো—সব মিলিয়ে যেন দাড়িপ্রীতিরই প্রমূর্ত—'প্রাইড ও প্রেজুডিস'।

বিংশ শতাব্দীর বুকের ওপর বসে 'বিংশ শতাব্দী' মাসিক পত্রিকা সাহিত্যের দাড়ি ওপড়াবেন, এমন কথা তো ছিল না।

॥ নতুন সাহিত্য ॥

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন ; প্রবাদ মাত্র এইটুকু বলেই থেমেছে। কিন্তু প্রমাদ ? সে থামতে জানে না। তাই যা সাহিত্যও নয় ; নতুন(?)ও নয়,—সেই রকম একটি পত্রিকার নাম 'নতুন সাহিত্য' ! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতায় এখন দুটি মাত্র দল সাহিত্য করছে। একদল বলছে যা বিক্রী হয়

তাই সাহিত্য ; অন্তদল : যা বিক্রী হয় না, তাই সাহিত্য। প্রথম দলের পত্রিকাগুলি বিকৃত ; দ্বিতীয় দলের অবিকৃত। এদের টাগ অফ ওয়ার দেখবার মত। প্রথম দল তবু এক-রকম ; কাগজ বেচার আনন্দে কথা বেচা বন্ধ ! দ্বিতীয় দলেরাই আসলে বেচারা ! কাগজ বেচা নেই ; বই বেচা নেই ; কাজে-কাজেই কথা বেচা ! দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতা পর্যন্ত বাদ নেই ; সাহিত্যের একমাত্র সমঝদার এই সব ছাপাওলা, বিজ্ঞাপনওলা, ব্লকওলারাই এখন সাহিত্যের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে এমন সব আপ্তবাক্য এমন সহজে বলছে যে রবীন্দ্রনাথকেও তা বলতে রীতিমত বেগ পেতে হত। এই সব সাহিত্যের আলু কাবলি-ওয়ালাদের প্রত্যেক দলের একজন করে গুরু আছে। কারুর বুদ্ধদেব ; কারুর প্রেমেন মিত্র ; কারুর বিষ্ণু দে ; কারুর আবার ঠিক নেই,—এ সপ্তাহে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ওসপ্তাহে অমিয় চক্রবর্তী। বাকী দু সপ্তাহ,—'বাংলা সাহিত্যের কিস্সু হচ্ছে না !' হাত-কাটা গেঞ্জি পরে চোখে রুমাল দিয়ে এই সব আলুকাবলী মার্কা সাহিত্যের কাবুলিওয়ালারা সারাদিন অবিরাম বক্ বক্, বক্, বক্ বক করে যাচ্ছে। এদের গুরুকে বাদ দিয়ে আর যাকেই গালাগাল দিন এরা আপনার সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু এদের গুরুকে গরু বলুন, সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে আসবে ল্যাংবোটেরা।

বাংলা সাহিত্যের যে মা-বাপ নেই তা প্রত্যয় হয় এদের কথা শুনলে। ডাক্তারী সম্বন্ধে কথা বলে না কেউ, ডাক্তাররা আর আসবে না বলে। ওকালতি সম্পর্কে কথা বললে উকীল আপনার নামেই মামলা করবে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য পিতৃমাতৃহারা অর্ফ্যান অথবা উদ্বাস্তু বোধ হয় ! যে খুসী তার খুতনি নেড়ে দিয়ে যাচ্ছে ; গালে ঠোনা মারছে ; কেউ কেশাকর্ষণ করতেও দ্বিধা করছে না। বাপের আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিলেন যে যুগে পরশুরাম ; এ যুগে পরশুরাম থেকে বাংলা সাহিত্যের যারা কেউ নয়, সেই রামশ্যামযদুরা মাতৃভাষাকে হত্যা নয় শুধু, জবাই করেও বিরাম মানছে না কেউ ; কেউ আবার তারপর একদম নির্বাক ; কেউ অতি চতুর,—রংবেরং জীব, দুষ্কার্য সারা হয়ে গেলে সরবে কবীরের দোঁহা গাইছে। আর কেউ বসে আছে আপন গৃহে গুপ্ত সম্রাটদের মত। যার সম্বন্ধে, যা কিছু সম্বন্ধে

মত চান তক্ষুণি অবলীলাক্রমে বিতরণ করছেন। বিতরণ করতে পারছেন কারণ কোন মতটাই তাঁর নিজের নয়। বিনোবা ভাবের জমিদানের মত আর কি! জমি নিজের নয় কাজেই দান করতে বিনোবা ভাবেন না!

আসল কথা হচ্ছে কোনও এক সময়ে এরা সাহিত্যিক হবেন ভেবেছিলেন। না হতে পেরে এরা কেউ বিজ্ঞাপনওলা cum পাব্লিশার; কেউ ছাপাওলা cum পাব্লিশার হয়েছেন। ফলে কামাই নেই সাহিত্য সম্বন্ধে আলটু বালটু বকার। আর বকে বকে যখন পরিশ্রান্ত তখন সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয়ে যায় বিজ্ঞাপনের কপির ওপর। বাংলা বই এক ভ্রাবহ অভিজ্ঞতা; বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন বর্তমানে হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও শান্তির বড় শত্রু। এরাই, এই সব মালেদের ধারণা বই বা কাগজ বিক্রী না হলেই সাহিত্য হল। যা লোকে বোঝে না তাই সত্যকীরের মহৎ সৃষ্টি। উদাহরণ দেয়, বই বিক্রী ত' শশধর দত্তরও হয়; বিক্রী হয় বলেই কি তা সাহিত্য? না। নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে শরৎ চন্দ্রও বিক্রী হয় যে! সেক্সপীয়রের বিক্রী যে এখনও অটুট। বিক্রী হয় বলে কি শরৎচন্দ্র সাহিত্য ভ্রষ্ট?

এই ফ্রাষ্ট্রেটেড সাহিত্যিকন্মন্য অজাম্বুরেরাই সাহিত্যে সর্বদাই নূতন কিছু করার জন্য উদ্যোগী। ডি. এল. রায়ের সেই: একটা নূতন কিছু কর! এদের বধির কর্ণে প্রবেশ করবে না জেনেও রবীন্দ্রনাথ বিরত হন নি লিখতে:

কোনো একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টি ছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি সেই জন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সৃচনা হ'ল, সেও অসংগত [সাহিত্যের পথে]

কিন্তু বেনাবনে আর মুক্তোর ছড়ার দাম কি?

নূতন সাহিত্য নামধেয় এই না-নূতন, না সাহিত্য পত্রিকার পত্রে পত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আপ্ত বাক্য ছড়িয়ে রয়েছে! ছত্রে ছত্রে ছত্রাকার হয়ে! ননী ভৌমিকের উপন্যাস ধুলোমাটির সমালোচনা পড়ুন নতুন সাহিত্যে:

প্রথম ব্যতিক্রম যা চোখে পড়েছে সে হচ্ছে গোর্কীর মাতৃচরিত্র। ননী ভৌমিকের মোহিনী দেবী ঠিক তাঁর মত সার্থক না হলেও তাঁরই সঙ্গে তুলনীয়।"

গোর্কীর MOTHER কে নিয়ে এমন তুলনীয় ইয়ার্কি এদেশেই সম্ভব!:

'নতুন সাহিত্য' যখন সাহিত্য সমালোচনা করতে বসে তখন লেখে:

ভালো সাহিত্যের লক্ষ্যও পাঠক বটে। কিন্তু সস্তায় পাঠককে খুশি করা নয়।

ভালো। সেই নতুন সাহিত্য কি মহার্ঘ বস্তুতে পাঠককে খুশি করতে চায় তার নমুনা, বৈশাখ সংখ্যার একটি গল্প, 'সোনা রূপার কাঠি'তে ধুলোমাটির চেয়েও ভুরি পরিমান :

কাজল দলা মেঘ [পৃঃ ২৮]; গল্পটা অনেকদূর গড়াতে পারা ভবিষ্যৎকে লেজে বেঁধে আছে [পৃঃ ৬৭]; সেই সব গাঢ় দিন-গুলো মনে পড়ে তপতীর [পৃঃ ৫৭]; মন ক্ষেপে বৃষ্টি এল [পৃঃ ৩৬]; বুকের মধ্যে যেন ভাঁড়ার ঘরে জানলায় দেখা আমডালের চড়ুইটা রয়েছে [পৃঃ ২৯]; আচমকা নাথ জাগে অপরেশন থিয়েটারের সমস্ত ফরাসী জানালাগুলো খুলে আকাশের হু হু মৌসুমীতে একটা ছোট ফড়িঙের মত ওলোট পালোট খেতে [পৃঃ ১]

এগুলো সবই স্যাকরার ঠুকঠাক ; কামারের এক ঘা অবশ্য এর পরেই :

পিছন না ফিরেও তপতী বুঝতে পেরেছিল সেদিন, মাথা নাড়লেন বাবা। ক্লান্ত বৃদ্ধ গোরুর মত শুটিয়ে বসলেন জীর্ণ তক্তপোশটির ওপর। আশাহত। সেই বারই বাবা মারা যান [পৃঃ ২৯];

তপতীর বাবা না হয় মরে বেঁচেছেন। কিন্তু ক্লান্ত বৃদ্ধ গোরুর মত সব বাবার ত সে সৌভাগ্যও হয় না!

কেবলমাত্র চটুল মুখোরোচক মন্তব্য করবার কারণেই উপরের উদ্ধৃতি নয়। আমরা ইদানিং লক্ষ্য করছি তরুণ কবিরা পদ্য লিখতে হলেই যে কটি শব্দ ব্যবহার করছেনই, তা হল যথাক্রমে হিজলবন ধানসিঁড়ি ইত্যাদি। তরুণ গল্পকাররাও গল্প লিখতে হলেই আগে থেকে কতকগুলো কিম্ভূত এক্সপ্রেসনের একটি তালিকা প্রস্তুত করে একটির পর একটি সেগুলি লাগিয়ে যান। যেন এক্সপ্রেসনগুলির উদ্ভটত্বের জন্য গল্পর জন্ম। ছেলে-বেলায় নূতন কথা শিখলে যেকোন উপায়ে তার ব্যবহারের জন্য মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত যেমন এমন জায়-গায় লাগানো যাতে বিদ্যাবুদ্ধির হাঁড়ি হাটের মধ্যেই চৌচির। নূতন সাহিত্য করতে সুরু করেও এইসব গল্পকারদের সেই একই হাল।

সাদামাটা ভাষার জীবনের গল্প যদি না লিখতে পারা যায় তাহলে সুবোধ ঘোষের তৃতীয় শ্রেণীর অনু-করণ করে পার্ভার্টেড, অলীক, অন-ভিজ্ঞ জীবনের গপ্পো লিখলে তা ছাপা যায় কিন্তু পড়া যায় না। এবং এগল্প যিনি লেখেন তাকে অমৃতম বালভাষিতম বলে না হয়

ক্ষমা করা গেল। কিন্তু যিনি ছাপেন তাঁকে সম্পাদক বলে স্বীকার করতে যাবে। নূতন সাহিত্য রচনার চেয়ে নূতন সাহিত্য সম্পাদনার দায়িত্ব কম নয়। অনেকগুলি পাতা বৈশাখ 'গ্রন্থ নষ্ট করেছে নতুন সাহিত্যের এই প্রকাশ অযোগ্য রচনাটি। তবে ভরসার কথা এই যে রাবিশ থেকে সৃষ্টি হয় নূতন কাগজ। সাহিত্যের রাবিশ থেকে নূতন হীরের টুকরো যেমন, তেমনই বাজে কাগজের রাবিশ থেকে আবার সাদা তকতকে স্পটলেশ কাগজ!

॥ অশ্রুধারা ॥

কোন একটি পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে গত সংখ্যায় আমাদের অনুরূপ মন্তব্যে কেউ কেউ রীতিমত বিচলিত হয়েছেন। সমালোচিত এক পত্রিকার এক কর্ণধার একজন ব্যঙ্গচিত্রীকে কানে কানে বলেছিলেন অচলপত্রের জন্য ব্যঙ্গচিত্র না আঁকতে ভবিষ্যতে। এই উপদেশ, টাকার প্রলোভন ত্যাগ করতে না পারা আমাদের দেশের অত্যন্ত দুস্থ ব্যঙ্গচিত্রী যদি মেনে নিতে বাধ্য হন, তাতে তাঁকে দোষ দেব না। কিন্তু আরেক dose নাক্সভমিকা দেব পত্রিকার পরিচালককে। অচলপত্রে যে ব্যঙ্গচিত্রগুলি প্রকাশিত হয় তার প্রত্যেকটির পরিকল্পনা অচলপত্রের নিজস্ব। সেই ব্যঙ্গচিত্রীও জানেন যে তিনি অচলপত্রের নন, অচলপত্রই তাঁর সুদর্শন। কাজেই শুধু ব্যঙ্গচিত্রী নয়, কোনও কুব্যঙ্গচিত্রীও যদি অচলপত্রে না লেখে তাতেও অচলপত্র অচল হবেনা। বর্তমানে বাংলাদেশে তরুণতম যারা সাহিত্যে নিজেদের আসন পাকা করছেন তাঁদের সকলেরই জন্ম এই আঁতুড়ে। এ দেশে কেউ টাকার জোরে সম্পাদক, কেউ কপাল জোরে; কেউ অস্থায়ী সম্পাদক, কেউ এক লাইন না লিখেও চিরস্থায়ী। অচলপত্রের সম্পাদক গায়ের জোরে নয়, কলমের জোরেই সম্পাদক। অচলপত্রের নব পর্যায়ের প্রথম সংখ্যার প্রায় সবগুলি সাদা পাতা তিনি একাই কালো করেছেন। প্রয়োজন হলে সংখ্যার পর সংখ্যা তাই করতে তাঁর কলমে কালি শুকাবে না। তিনি একাই একশ' (এবং Shaw-র চেয়েও বেশী)। এবং তাঁর একার লেখার জন্যই অচলপত্র কিনবার লোকের অভাব হবেনা। অচলপত্রও যেমন একটাই

সম্ভব, তার সম্পাদকও তেমনি বাংলা দেশে দ্বিতীয়রহিত একক ব্যক্তিত্ব। বল্লমের চেয়েও তীক্ষ্ণ তাঁর কলম; যাদের ছিন্নভিন্ন করে, তারা যবনজনোচিত পিছন থেকে আঘাত করায় পটু, জানি। কিন্তু মামলা করে, ভয় দেখিয়ে, অচলপত্রকে বাধা দেয়া যায় কিন্তু বন্ধ করা অপার।

॥ কেঁচো খুঁড়তে সাপ ॥

তরতর করে.....

কবি মণি রায় রেডিওতে talk দিতে গেলে প্রেমেন্দ্র মিত্র জিজ্ঞেস করেন: মণীন্দ্র, তুমি চাষবাস সম্বন্ধে talk দাও কি করে? মণিবাবু তার জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করেন: সাহিত্য একাদেমী ঘোষণা করেছে যে ওথেলোর বাংলা অনুবাদ আপনি করবেন, সে কাজ এগুচ্ছে কেমন? প্রেমেন্দ্রবাবু বলেন: ও তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। talk দিয়ে আসবার পর মণি রায়কে প্রেমেন্দ্র মিত্র আবার না জিজ্ঞেস করে পারেন না: আচ্ছা মণীন্দ্র, চাষবাস সম্বন্ধে talk তুমি দাও কি করে? এবার আর মণীন্দ্র চুপ করে থাকেন না; জবাব দেন; ও তরতর করে দিয়ে যাই আমি.....।

শ্রীবিষ্ণুর একশ' একটি নাম!

বর্তমানে একমাত্র বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী কবি শ্রীবিষ্ণু দে (হে বিদেশী fool) কি বেনামে ইংরাজিতে প্রবন্ধ লিখছেন স্টেটসম্যানে? কিন্তু সে বেনামে লিখছেন ওই রকম একটা নাম [illegible] যদি তাঁর এত স্পৃহা ছিল ত' আমাদের বললেন না কেন? শচীন দেব বর্মণের নামে লিখবার পরামর্শ দিতাম আমরা! বেনামে লিখছেন তার চেয়ে অনেক জুতের হত না?

॥ সাহিত্য দুঃসম্বাদ ॥

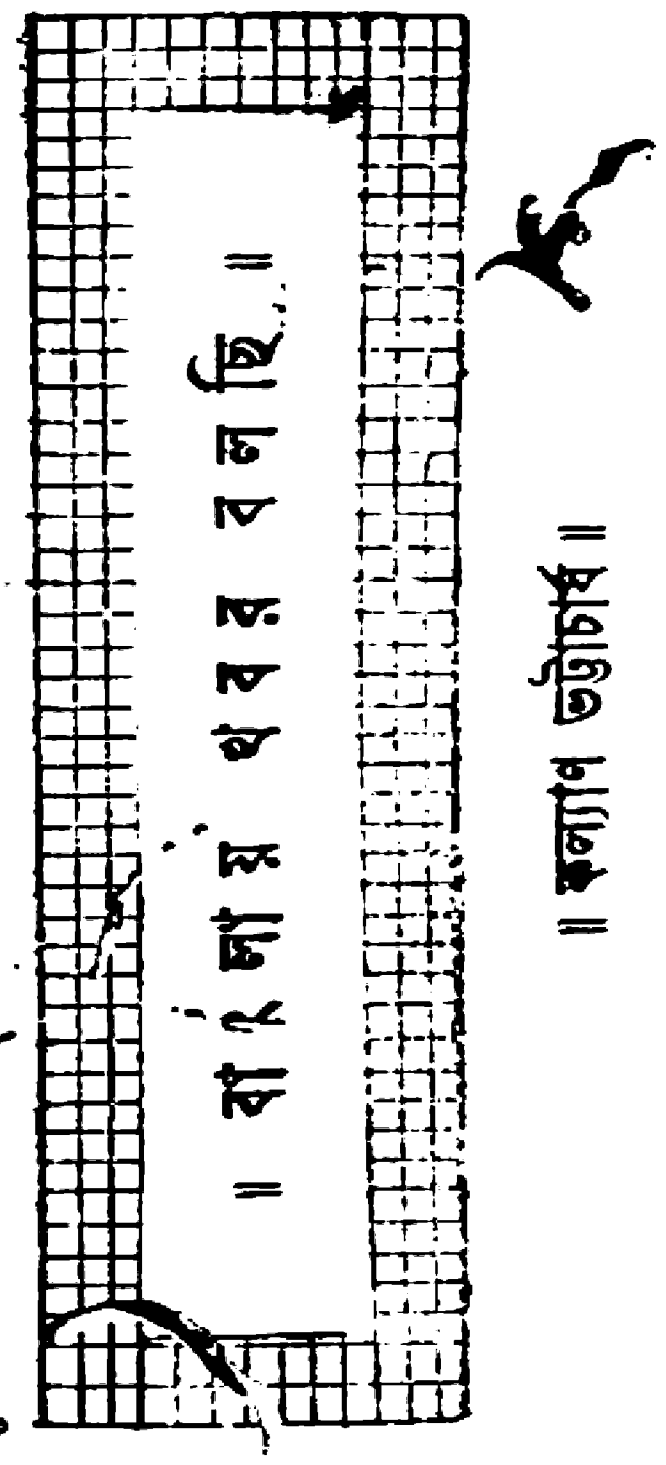

॥ **কৃষ্ণ মসীলিপ্ত বাজেট** (সাম্য ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত : সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণ) ॥

বিগত পনেরই মে, উনিশ শ সাতান্ন, বুধবার অপরাহ্ণ পাঁচটায়, সাধারণ দর্শকের ভূমিকায় কংগ্রেস সভাপতি ধেবর অলংকৃত লোকসভায় ; সাতান্ন বৎসর বয়স্ক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তিরু-ভাল্লুর থাট্টাই কৃষ্ণমাচারী (tax, throttle, kill : কামাথের নাম-করণ) বাজেট পেশ করেন। অর্থ-মন্ত্রীর বাদামী রঙের নূতন ব্রীফকেস থেকে যে বাজেট আত্মপ্রকাশ করে তা বক্তব্য ও পরিবেশনের নূতনত্বে পূর্বসূরীদের সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করে। মন্তব্য উল্লেখে অক্ষম বাজেট সত্যই অনুল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমান বাজেট কংগ্রেস ও কৃষ্ণমাচারীর পক্ষে কতটা স্বাস্থ্যকর এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেই সন্দিহান, বিতর্ক ও প্রতিবাদ এতই স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুদূরপ্রসারী।

এহেন বিতর্কমূলক বাজেট গৃহীত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বছরে ৯০ কোটি টাকা আয় বাড়বে বলে প্রকাশ্যে কর প্রস্তাবনা উত্থাপনের আগে 'সাহস সঞ্চার ও নিজেকে রক্ষা করবার জন্য একবার' (পি, টি, আই) দুবার (সাপ্তাহিক কারেন্ট বাইশে মে) জলপান করে ; অর্থমন্ত্রী

নব্বই মিনিট ব্যাপী বক্তৃতায় শুধু-মাত্র শুল্ক তালিকায় নব্বইটি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করেন। (সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণ করিবার জন্য কংগ্রেস সরকার কী সাংঘাতিক বেপরোয়া। স্বাধীনতা সম্পাদকীয়ঃ সতেরই মে) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে বদ্ধপরিকর 'দলের সামান্য অঙ্গ মাত্র' (নিজের সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রীর মন্তব্য) কৃষ্ণমাচারীর কর প্রস্তাবনার কল্যাণে 'কারুর রেহাই নেই' (ষ্টেটস্‌ম্যান, ষোলই মে)। সাম্য ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত (অর্থমন্ত্রীর মতে) বাজেটে যে ৯৩ কোটি টাকার বাড়তি আয়ের প্রতিশ্রুতি অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন তার: শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি তিনি সাধারণ মানুষের নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন (স্বাধীনতা, সতেরই মে)।

নব্বইটি পণ্যের উপর 'সামান্য পরিমাণে' (আনন্দবাজার, ষোলই মে) শুল্ক হার বৃদ্ধি সমন্বিত বাজেট, দুটি সম্পূর্ণ নূতন কর প্রস্তাবনায় অসামান্য। শুল্ক হারবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হয়ে অর্থমন্ত্রী দুটি একেবারে নূতন কর প্রস্তাব করেছেন সম্পদ ও ব্যয়কর। এবং শেষেরটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বর্জিত।...যেহেতু কার্যকরী হতে এখনও এক বছর দেরী, এখনও তবে দেখবার অবকাশ আছে: স্টেটস্‌ম্যান, ষোলই মে। (সংশোধনের কোন অবকাশ নেই: শ্রীনেহরু, তিরিশে মে।) সম্পদ ও ব্যয়কর পর্যায়ে রাজাগোপালাচারীর সমালোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, জাতীয় সমাজতন্ত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা একটি বিরাট অত্যাচার। এসব চূড়ান্ত দুর্দশা ও সাধারণ চরিত্র ভ্রংশের সূচনা করে.....এর ফলে থম্‌থমে আবহাওয়া এবং বিশ্বব্যাপী এমন এক অবস্থার উদ্ভব হবে যার চেয়ে সোজসুজি কম্যুনিষ্ট রাজ্যও শ্রেয়।

কৃষ্ণমাচারী-বাজেট যে দিক থেকে সব চে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে নীতি নির্বাচনের আশ্চর্যজনক সংঘাত। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং বিশাল পরিকল্পনার সঠিক সংমিশ্রন যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। (আমাদের পরিকল্পনা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী—একথা উচ্চারণের অর্থ হচ্ছে পূর্বাহ্নে পরাজয় স্বীকারের ঘোষণা মাত্র।)

যে চারটি মাপকাঠির সাহায্যে এই সব নীতি নির্দ্ধারণ সম্ভব হয়েছে তার দ্বিতীয়টি: অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহ

দান। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত জিনিষের করভার বৃদ্ধির প্রস্তাবে প্রোজ্জ্বল কৃষ্ণমাচারী বাজেটের, সাধারণ মানুষকে স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহ দান প্রসঙ্গে বম্বের দৈনিক সংবাদপত্র 'ফ্রি প্রেস জার্ণাল'-এর সম্পাদকীয় উক্তি অতীব স্মরণীয়: এই করনীতি সঞ্চয় ব্যাপারে উৎসাহ দানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা অর্থমন্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত। এক কথায় তিনি সমস্ত উৎসাহ হত্যা করেছেন। All important পরিকল্পনার জন্য সাধারণ মানুষ অন্তত কিছুমাত্র সঞ্চয়ে অপারক আজ।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই নিরপেক্ষ (অর্থমন্ত্রীর মতে) করনীতির পক্ষপাতিত্বের সমালোচনা করে রাজ্যসভার কম্যুনিষ্ট সদস্য ভূপেশ গুপ্ত দীর্ঘ তথ্যবহুল বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেন: সাধারণের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত কঠোর এবং পাশবিক নীতি অবলম্বন করে তাঁর বিত্তশালী বন্ধুদের বেলায় উদার এবং মহৎ।

বক্তব্য সপ্রমাণিত করতে ভূপেশ গুপ্ত একাধিক উদাহরণের অবতারণা করেন। তার একটি: যাঁদের উপার্জিত আয় দুলক্ষ টাকা তাঁরা এখন কর দেন ১৪৪,৬০৪ টাকা। এই সব প্রস্তাব গৃহীত হলে অর্থমন্ত্রীর ঔদার্যে তাঁরাই দেবেন ১২৮,০০০ টাকা মাত্র। অর্থাৎ বর্তমানের তুলনীয় ১৬,৬০৪ টাকা কম। এই তো অবস্থা।——এর উত্তরে তিনি বলবেন যে কংগ্রেসের লক্ষপতি বন্ধুদের অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহ দেবার জন্য এ ব্যবস্থা। কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ তো দেওয়া হয়েছে!

গত বছর ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশী অর্থনীতিজ্ঞ, অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডোর এ দেশে আসেন। তাঁর তথ্যবহুল সুপারিশের উপর নির্ভরশীলতা এবং কর কাঠামোর পরিবর্তন কৃষ্ণমাচারী বাজেটের অন্যতম লক্ষ্যনীয় প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে স্টেটস্‌ম্যান বলেন: প্রফেসার ক্যালডোরের নীতি এ বাজেটের ভিত্তি! বলে এই আমূল পরিবর্তনে কৃষ্ণমাচারী কতদূর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্পষ্ট।

ক্যালডোর সুপারিশের উপর নির্ভরশীলতা বিকৃত বলে প্রতিপন্ন করেছে স্বাধীনতা (বিশে মে): ক্যালডোর দেখেছিলেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে গেলে ৫ বছরে ১২৫০ কোটি টাকা

অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করা দরকার হবে। তিনি বলেছিলেন যে এটা আদৌ অসম্ভব হবে না যদি ভারতের জনতার যে এক শতাংশ ধনী লোক আছে তাদের থেকে যথোপযুক্ত হারে ও কার্য্যকরী পদ্ধতিতে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা যায়। তিনি একটা পঞ্চমুখী ব্যক্তিগত ট্যাক্স ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করবার সুপারিশ করে বলেছিলেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এর থেকেই হতে পারবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন যে ব্যক্তিগত কর আদায়ের পর যেটুকু ঘাটতি পড়বে সেই ঘাটতি জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ কয়েকটি ক্ষেত্রে ট্যাক্স ধার্য করে পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভাবে আরও বলেছিলেন যে প্রত্যক্ষ কর বসাবার পর মাত্র যেটুকু ঘাটতি পড়ে (যদি কোন ঘাটতি আদৌ পড়ে) সেই ঘাটতিটুকু পূরণের জন্য নিতান্ত অগতির গতি হিসাবেই উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা উচিত। কিন্তু অধ্যাপক ক্যালডোরের সুপারিশ কাজে লাগালে কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র গড়া যায় না।

কারেন্টের মতে কৃষ্ণমাচারীর এই অনুকরণ অক্ষম। তাঁরা মন্তব্য করেন কৃষ্ণমাচারীর বাজেট প্রঃ ক্যালডোরের সুপারিশের অবৈধ প্রশাখা মাত্র।

বক্তৃতার এক জায়গায় কর এড়ানর প্রচেষ্টা বন্ধ করা সম্ভব বলে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু কিছুদিন আগে সরকারী বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষায় কর এড়ানর প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে এই এক ব্যক্তিই অত্যন্ত সন্দিহান ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক ক্যালডোরের অনুসন্ধান অনুযায়ী আয়কর হিসাবে সরকারী তহবিলে দু কোটি টাকা মারা গেছে। (সেটা উদ্ধার করুন আগে: ভূপেশ গুপ্ত)

॥ **আশু প্রতিক্রিয়া** ॥ (বৈপ্লবিক পদক্ষেপ: সমাজতন্ত্রের নামগন্ধ বিবর্জিত: অর্থমন্ত্রীর অসম সাহস)॥

রবিকরোত্তাপের চেয়েও উত্তপ্ত কৃষ্ণমাচারী করপ্রদাহে নজের অঙ্কের ১১২ ডিগ্রী তাপমাত্রা-বিস্তৃত নয়া দিল্লীর সেদিন জিজিয়া করের কথা স্মরণ হয়েছিল কি না বলা শক্ত। দেশব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, স্বাধীন ভারতের লোকসভায় এযাবত যে

ENDED-2006

কজন অর্থমন্ত্রী যতগুলি বাজেট পেশ করেছেন, কৃষ্ণমাচারীর বর্তমান বাজেট শুধু তাদের ম্লান করে ক্ষান্ত হয়নি, ভবিষ্যতও নিজেকে অম্লান করার ব্যবস্থা করেছে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার সময়, প্রায় প্রত্যেক সদস্যের বিস্ময়জনিত অস্ফুট মন্তব্য ও হতাশাব্যঞ্জক দীর্ঘঃশ্বাস নেপথ্য সঙ্গীতের কাজ করে সেদিন। সভাকক্ষে অনৈসর্গিক কিছু হলেও বোধ হয় কেউ আশ্চর্য হতেন না, মনে হত এও বুঝি বা কৃষ্ণমাচারী বাজেটের অন্যতম অঙ্গ। লোকসভার পাঁচ শতাধিক সদস্যের সহস্রাধিক প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক আপত্তির কারণ কিন্তু এক। কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট নির্বিশেষে প্রত্যেকের ধারণা যে এর ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা আজ আরও বাড়বে। ডাকমাশুল, রেলযাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধি এবং আয়কর যোগ্য আয়ের পরিমাণ ৪২০০৲ থেকে টাকায় নির্ধারণ সম্পর্কেই প্রতিক্রিয়া সব চেয়ে বেশী। অবশ্য সম্পদ ও ব্যয়কর অনেকের মধ্যে শুভ লক্ষণ।

বাজেটের আশু প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কংগ্রেস সদস্য ফিরোজ গান্ধীর মাথা ঝিম ঝিম করে। সাধারণ মানুষের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে ধনীব্যক্তির ভার লাঘব করা হয়েছে বলে সি সিংহ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সমাজতন্ত্রী দলনেতা আচার্য পত্নী কংগ্রেস সদস্যা সুচেতা কৃ মতে : গরীব মানুষের বোঝা ইহা আরও একটি শাকের সম্পদ ও ব্যয় কর ধার্যের জন্য শাসনতান্ত্রিক অসুবিধার উল্ল বলে জি. ডি. সোমানি আশঙ্কা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে মনোনীত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনী সম্পূর্ণ অসু অক্ষমতা জানান। এবং বুদ্ধির উ ধার্য করা হয়নি বলে ডাঃ অসুপ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সমাজতন্ত্রের দিকে প্রথম প পদক্ষেপে উদ্যত (দেওয়ান চমনব মতে) এই বাজেট সম্পর্কে সভার কমিউনিষ্ট দল নেতা এ ভাঙ্গে, কৃচ্ছ্র সাধনের সাহায্যে তন্ত্রে পৌছান যাবে কি না সম্বন্ধে প্রকাশ করেন। তবে অন্য পি. টি. পুন্নোসের মতে অবশ্য তন্ত্রের নাম-গন্ধ বিবর্জিত এ-বা লোকসভায় তাদের প্রশ্নগুলির কর ধার্য করা হয় নি অন্যতম ক সদস্য ভি. পি. নায়ার ঈশ্বরকে ধ দেন।